স্বর্গ

স্বর্গ

শ্রীসুবোধ বসু
লিখিত

চিত্রাঙ্গদা পাব্‌লিশিং হাউস
কলিকাতা

বৈশাখ, ১৩৪৫

২৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-স্থ রামকুমার মেসিন প্রেস হইতে শ্রীজনার্দ্দন কর কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৩৯, মহানির্ব্বাণ রোড্, কলিকাতা হইতে চিত্রাঙ্গদা পাব্‌লিশিং হাউসের পক্ষে শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চিত্রাকে

শ্রীসুবোধ বসু লিখিত
পুস্তকাবলী

মানবের শত্রু নারী

নবমেঘদূত

নটী

বন্দিনী

কলেবর

স্ত্রী-যুদ্ধ

অতিথি

স্বর্গ

—এক—

গৃহিণী সচিবঃ সখী

চামেলী নতুন গিন্নী হয়েচে। তার তরুণ স্বামী প্রশান্ত এমন একটা ইঙ্গিত করেচে যে সে তার প্রতি কাজে সতর্ক নজর রাখচে—গিন্নীপনার কোনও ভুলচুকই তার চোখ এড়াচ্চে না। পূজোর ছুটিতে রিপোর্ট কর্‌বে প্রশান্তর মায়ের কাছে—এখন কিছু বল্‌বে না।

ভবিষ্যতে শাশুড়ির কাছে অপটুতার জন্য জবাবদিহি হতে হবে বলে ভয়ে চামেলীর চোখে তো আর ঘুম নেই। সে ব্যবস্থা দিলে—অত তাড়াতাড়ি অপিসে গেলে আজ মাছের ঝোল হবে না—শুধু ডাল দিয়ে খেয়ে যেতে হবে;—সহরের ঘি বড্ড ভেজাল-দেওয়া, ও খেয়ে কাজ নেই।—ও হরি, ফর্সা প্যাণ্ট্ তো আর বাক্সে

নেই, কি হবে? অপিস যাবে কি করে? কালকের ময়লাটাতে কাজ চালিয়ে নেবে কিগো—সেটা আজ ধুয়ে দিয়েচি যে।—কি বিশ্রী সব খাবার খেতে হয় অপিস থেকে ফিরে এসে। আজ ছোলা ভিজিয়ে রাখ্‌ব—এসে খেয়ো। ছোলা খেলে নাকি গায়ে ভারি জোর হয়।—ওমা, ট্রামের পাস্‌টা আবার কোথায় রাখলুম—ঐ যাঃ, আর তো খুঁজে পাচ্ছি না। এরি মধ্যে সময় হয়ে গেল না কি? তা না হয় পয়সা খরচ করেই যাও। মাথার তেলের বড় বোতলটা পরশু এনেছিলে তো—কালই হাত থেকে পড়ে চৌচির হয়ে ভেঙে গেল। অপিস থেকে ফেরার পথে একটা নিয়ে এসো। আর একটা মাখনের কৌটা—বাঃ রে, অমন করে তাকালে কি হবে? অত বেশি করে খেলে দুদিনের বেশি যায় কি করে?

কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রশান্ত সব বুঝে নিয়েছে—সমস্ত চামেলীর দুষ্টুমি। অত্যন্ত সুষ্ঠু পরিচালনায় তার সংসার চল্‌চে। যখন যেমনটি প্রয়োজন, আশ্চর্য্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তারা উপস্থিত হয়; অদ্ভুত দূরদর্শিতার সঙ্গে প্রতিটি জিনিষের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। একটু অপব্যয় হতে পারে না,—একটু অগোছাল হতে পারে

না কিছু। যেন কত কালের পাকা গিন্নী সে,—এমনই তরুণী চামেলীর স্বভাবনৈপুণ্য।

কিন্তু তা হলে কি হয়, প্রশান্তকে উদ্বিগ্ন করবার মত যত রকম কল্পনা করা যেতে পারে, চামেলী তার কোনটাকেই বাদ দেয় না। অচিন্তিত বিপদের সমুখে প্রশান্ত যখন বিব্রত বোধ করে, চামেলী হেসে কুটি কুটি হয়—ভাবনার যে কোনই প্রয়োজন নেই, চামেলী সব ব্যবস্থাই করে রেখেচে, এইটে প্রকাশ হতে আর দেরি হয় না।

গৃহই যে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত স্থান, চামেলীর এই পারদর্শিতার পর আর তাতে সন্দেহ থাকে না। কিন্তু চামেলী জেনানায় থাকার মেয়েই নয়। তাকে অহরহ নিয়ে যেতে হবে ময়দানে হাওয়া খেতে, গঙ্গার পারে, নিউমার্কেটে জিনিষ কিন্‌তে; সিনেমাতে দেখ্‌তে ইংরেজি ছবি। সপ্তাহে সে একদিন কর্‌বে অন্যদের নেমন্তন্ন; আর দুদিন যাবে পরিচিতদের বাড়ি বেড়াতে। চামেলীকে আদর্শ ধর্‌লে, এর পর আর বলা চলে না, গৃহান্তঃপুরই স্ত্রীলোকের উপযুক্ত স্থান। তবে চামেলী চাকরি কর্‌বার জন্য বায়না করে না—কেবল লটারীতে অনেক টাকা পেতে চায়। সে টাকার সবটা সে নিজে ব্যয়

করতেও চায় না ; অর্দ্ধেক দিয়ে দেবে রাস্তার ভিখিরিদের জন্য একটা দশতলা প্রাসাদ তৈরি করতে ; তাতে প্রত্যেকের আলাদা ঘর থাকবে ; ফর্সা ধপ্ধপে বিছানা ; এক বাক্স ভরতি ধোপফেরত কাপড়জামা ; একটা করে' খাবার টেবিল ; বড় দেখতে আয়না ; টাকায় কুলোলে প্রত্যেক ঘরে একটা করে রেডিয়ো-সেট্ ইত্যাদি। কিন্তু কোনও দিন চামেলী লটারীতে একটা পুতুলও পায় নি।

শনিবার। দুপুরেই প্রশান্ত ফিরে এসেচে। এক গেলাস ভরতি ঠাণ্ডা লিমন স্কোয়াস খেয়ে চলে গেল সে অপিস ঘরে। ড্রয়ারের মধ্য থেকে টেনে বের করলে এক গম্ভীরদর্শন ইংরেজি বই। ইজিচেয়ারে সেটা নিয়ে শুয়ে পড়ল। ইচ্ছে, আজ আর বেরুবে না। সীরিয়স্ বই পড়্বার অভ্যেস প্রায় চলে যেতে বসেচে—আজ গভীর মনঃসংযোগ করবে সে।

উপরের রান্না ঘরে চামেলী খাবার তৈরির তদারক করতে গিয়েছিলো। খাবার প্রস্তুত হয়ে যাবার পর সে নিচে নেমে এল। পা টিপে টিপে অপিস ঘরের দরজার ধারে এসে দাঁড়িয়ে পর্দ্দাটা ঈষৎ সরিয়ে নাকটা ঢুকিয়ে উঁকি দিয়ে দেখ্লে—মুখখানা হাঁড়ির মত করে' প্রশান্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে বই পড়চে। যে বই

পড়তে গেলে মুখটা অমন হয়, তার বিষয়বস্তুর কথা কল্পনা করেই চামেলীর পেট ফুঁড়ে' হাসির কুণ্ডলী বেরিয়ে আসবার উপক্রম হল—মুখে কাপড় গুঁজে তাড়াতাড়ি সে ছুটে' পালাল।

প্রশান্তের জলখাবার নিজে নিয়ে গেল না চামেলী—চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ফুলে' ফুলে' হাসতে লাগল। তারপর উঠে মুখ ধুয়ে এসে তাড়াতাড়ি নিল সেজে; বেড়াতে বের হবে এক্ষুণি। পা টিপে টিপে প্রশান্তের পড়বার ঘরে গিয়ে পেছন থেকে তার দুচোখ চেপে ধরলে। হেসে বল্লে—বল, আমি কে?

প্রশান্ত গম্ভীর সুরে বল্লে—বুঝতে পারচি না তো! জ্যাঠাইমা কি? না না বুঝতে পেরেছি এবার—সদু পিসি।

'যাও', বলে' চামেলী চোখ ছেড়ে দিলে। চেয়ারের পেছনে কনুইটা রেখে বল্লে—'গুরুজনদের নাম করে' এমন বিশ্রী ঠাট্টা কর!'

'বাঃ রে, কি করে বুঝব আমি?' প্রশান্ত নিরপরাধের মত বল্লে।

'থাক্, তোমাকে বুঝ্‌তে হবে না', চামেলা বল্লে—'ওঠ এবার। বাইরে বের হ'তে হবে।'

'সর্ব্বনাশ', সাতঙ্কে প্রশান্ত বলে উঠ্‌ল। 'এই বইটাকে আজই শেষ করতে হবে—পরের বই এনে কত দিন আর ফেলে রাখ্‌তে পারি ?'

'তা ওটা না হয় কালই ফেরত দিয়ে এস—ও বিশ্রী বই পড়ে কোন্‌ লাভটা ?'

'বিশ্রী বই ? তুমি বল কি ? মার্কাস অরিলিয়সের লেখা।'

'তিনি আবার কিনি ?' চামেলী অবজ্ঞার সঙ্গে শুধোলে।

'Stoicism কাকে বলে জান ?'

'তা অবশ্যি জানি না,' চামেলী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্লে, 'কিন্তু তা পড়লে মুখটা যে হাঁড়ির মতন হয়ে ওঠে সেটা বেশ দেখ্‌তেই পেয়েচি।'

'কত বড় জ্ঞানের কথাটা, তা তুমি বুঝলেই না।'

বুঝতে চাইও না। যে সব জ্ঞান পিলে চম্‌কে দেয়, দুর্ভাবনায় একশেষ করে, সর্ব্বনাশের বিভীষিকা দেখিয়ে আশ্বাস দেয়, হাসিখুসি লোককে ব্যোম্‌ ভোলানাথ বানিয়ে ছাড়ে—সেই সব জ্ঞানের পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণিপাত—কিন্তু আমার কাছ থেকে তারা যেন অনুগ্রহ করে' দূরে থাকেন।'

স্পষ্ট দেখা গেল, চামেলীর এই নিন্দাবাদেও প্রশান্ত প্রবুদ্ধ হল না। বইটা সমাপ্ত কর্‌বার আগ্রহ যে তার প্রবল তা বুঝতে মোটেই দেরি হল না। ইতি মধ্যেই সে বইটা চোখের সমুখে তুলে ধরেচে।

'শুনচো ?'—চামেলী বল্লে।

'হুঁ'—বই থেকে চোখ না তুলেই প্রশান্ত জবাব দিলে।

'দরজির দোকানে যেতে হবে।'

'হুঁ।'

'যেখানে কাটা কাপড়ও কিনতে পাওয়া যায়।'

'বেশ।'

'তবে ওঠ।'

'এই উঠচি—বইটা শেষ করেই।'

প্রশান্ত যে এক বর্ণও শুনচে না, তাতে চামেলীর সন্দেহ রইল না। প্রশান্তের গভীর মনোনিবেশের দিকে চেয়ে মুখ টিপে' একটু হাসলে। পরক্ষণে সে খুব গম্ভীর হয়ে উঠল। বল্লে—'অদ্ভুত মানুষ যা হোক। গায়ে দেবার সেমিজ আমার সবগুলি গেছে ছিঁড়ে; সর্ব্বদা গায়ে দেবার ব্লাউজ না হলে চলাফেরাই বন্ধ করতে হবে —স্যাণ্ডাল ছিঁড়ে হিজিবিজি হয়ে গেছে—একটু কি হুঁস

আছে? বইয়েতে পড়তাম স্বামীদের কথা—কী চমৎকারই তারা হতো। একটু অসুবিধা হ'তে দিত না স্ত্রীদের: চাবার আগেই প্রয়োজনীয় জিনিষ এসে হাজির হতো। 'কী দরকার' 'কী দরকার' বলে স্বামী বেচারারা মাথা ধরিয়ে দিত। আর আমি? কী বিশ্রি ভাগ্যি করে এসেছিলাম পৃথিবীতে। ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া পরে কাটাচ্চি দিন; দুটো সেমিজের জন্য মাথা কুটে মরচি—কিন্তু কারুর কি হুঁস আছে!'

প্রশান্ত লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বই ছুঁড়ে ফেলেচে। অপরাধীর মত বল্লে,—কোথায় মিলি, তোমার সেমিজ লাগবে, আমায় বল নি তো! মানে, আমি,—অর্থাৎ—

মুখ ফিরিয়ে চামেলী হেসে নিয়ে বল্লে—না শুনতে পেলে আমি কি করবো। রোজ রোজ ক্যাঙ্‌লাপনা করতে আমার অপমান হয় না?

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় বদলাতে গেল। বেরুবার জন্য আর তাকে পীড়াপীড়ি করতে হল না।

দুজনে তারা গেল এক দোকানে। চামেলী অভ্যর্থনা-কারী কর্ম্মচারীকে বল্লে—'ডাকুন আপনাদের দরজিকে—জামার মাপ নিতে হবে।'

দরজিকে ডাকতে গেল সে চলে। প্রশান্ত বিস্মিত হয়ে বল্লে—সেমিজ এদের দিয়ে বানাবে ? কেন, তোমার কল কি বিগড়ে গেছে নাকি ?'

সংক্ষেপে চামেলী বল্লে—না।

বিব্রত হয়ে প্রশান্ত বল্লে—এই খোলা দোকানে—এদের বোধ হয় আলাদা ঘরও নেই···

'না থাক্‌ল।'

'প্রকাশ্যে···বুঝলে না···মানে···

দরজিকে নিয়ে লোকটা এসে পড়েছে। চামেলী বল্লে—'নিন ওঁর পাঞ্জাবীর মাপটা—চারটে হবে। খুব ভাল আদ্দি আছে তো—দেখি ?'

বাইরে যখন তারা বেরিয়ে এল, প্রশান্ত বল্লে—এ কি ?

'তোমার অর্দ্ধেক জামা যে ছিঁড়ে গেছে।'

'আর তোমার ?'

'একটা জামাও ছেঁড়েনি। শুন্‌চো,—চল গঙ্গার ধারে, বেড়িয়ে আসি। কি চমৎকার বিকেল হয়েছে।'

সন্ধ্যা অবধি তারা দুজনে হেসে গল্প করে গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াল, জেটিতে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে নৌকার সারি, পোর্ট কমিশনারের লঞ্চের পারাপার, গঙ্গার ওপারের চটকলের ইমারত।

'মিলি।'

'ইয়েস, সার।'

'চল, আউট্রামঘাটের ওপরতলার রেস্তঁরাতে গিয়ে দু গেলাস আইস্‌-ক্রীম সোডা খেয়ে আসি।'

'আমি এইখেনে দাঁড়িয়ে জলের বুকে নৌকার ছায়া দেখ্‌ব', চামেলী বল্লে।

'এত হেঁটেছি, আমার ক্ষিধেই পেয়ে গেচে। আমাকে একটা চপ্‌ ও খেতে হবে।'

'রেস্তঁরাতে আমি কাউকে খেতে দিইনে।'

'তবে না হয় ঐ আইস্‌-ক্রীম হকারটাকেই ডাকি।'

'খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁদরের মত নির্লজ্জ খাওয়া! ক্ষেপেচ তুমি?'

'কিন্তু ক্ষিধে পেয়েছে যে আমার।'

'তা বাড়ি গিয়ে খাবে বৈকি—খাওয়ার সময় তো হয়ে এল।'

'বাড়ি গিয়ে ভাল খাওয়াবে তো?'

চামেলী উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লে—'কি জানি, ঠাকুর কি করেচে। আমি বলে আস্‌বার সময় পেলুম কোথায়? আর মনেও ছিল না আমার; গিন্নীপনা কি আমার ধাতে পোষায়!'

বাড়ি ফিরে এসে বাইরের কাপড় বদ্‌লে নিয়ে চামেলী বল্লে—'আমি উপরে গেলুম : দেখে আসি ঠাকুর কি রাঁধ্‌লে। তুমি বারান্দায় হাওয়ায় বসে ক্ষিধেটা ঝালিয়ে নাও।'

চামেলীর ফিরতে হলো পনের কুড়ি মিনিট। ইতি-মধ্যে ক্ষিধেয় প্রশান্তর অবস্থা করুণ হয়ে উঠেছে। চামেলীকে দেখ্‌তে পেয়েই বল্লে—'হল চামেলী।'

'হয়েচে।'

'কি আজকের 'মেনু'?'

'যা আশঙ্কা করেছিলুম, তাই। প্রত্যেকটা কথা না বলে গেল, কিচ্ছু যদি বামুনটার মাথায় ঢুক্‌বে—একেবারে গোবর-ভরা মাথা। ভাবচি, এদিয়ে কী করে তুমি খাবে!' চামেলী ভারী লজ্জিত উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লে।

'কি হয়েচে রান্না? আমার যে ভারি ক্ষিধে পেয়েছে, মিলু!'

'মটরের ডাল, পোড়া পোড়া দেখ্‌তে ভেজেচে কত-গুলি আলুভাজা; ডাঁটা চচ্চড়ি আর ট্যাংড়া মাছের গঙ্গারজল ঝোল।...তার চেয়ে তোমাকে রেস্তঁরাতে তখন চপ্‌ খেতে দিলেই পারতুম। ভাবচি, কেন ছাই বেড়াতে গিছলুম···পেটই হয়তো ভর্‌বে না তোমার!'

ক্ষুধার্ত্ত প্রশান্তের প্রায় শুয়ে পড়বার অবস্থা হল। বামুনটা যেন বেছে বেছে তার সমস্ত অপ্রিয় পদগুলি রান্না করেচে। অথচ আজ যদি একটা ভোজ হত, তবেই তার ক্ষুধার উপযুক্ত হত। এমন কি চামেলীর উপরও অভিমান হল। সে যদি পাকা গিন্নী হত, তবে বামুনকে উপদেশ দিয়ে যেতে তার ভুল হ'তো না; শনিবার রাত্তিরের খাওয়াটার সে বিশেষ ব্যবস্থা করতে ভুল করত না।

বল্লে—'ও আমি খেতে পারব না; চল্লুম, কোনও রেস্তঁরাতে।'

চামেলী বল্লে—ছিঃ, রেস্তঁরাতে খেলে অসুখ করে যে।

'করুক্ অসুখ। এ বিশ্রী ডিনার আমি পারব না খেতে—ও খেলে আমার ঠিক বমি হয়ে যাবে।'

চামেলী তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে বল্লে—'ছিঃ, নিজের বাড়ি উপর কেউ এমন করে রাগ করে! ভাল হোক্, মন্দ হোক্—নিজের বাড়ি তো। দরকার হলে শাকভাতও খেতে হয়। তাছাড়া, তুমি কি আমাকে উপোস করিয়ে রাখ্‌বে, লক্ষীটি: রেস্তঁরাতে তো আমি খাই না; আর তুমি বাড়িতে না খেলে আমিই কি খাবো?'

'কিন্তু ডাঁটা চচ্চড়ি !' প্রশান্ত সভয়ে বল্লে।

'সত্যই আমার ঘাঁট হয়েচে। তখন রেস্তঁরাতে তোমায় চপ্ খেতে দিলেই হতো। কে জানত তখন !'

মুখটা হাঁড়ির মতন করে' চামেলীর পিছু পিছু প্রশান্ত খাবার টেবিলে গিয়ে বস্‌লে। কিন্তু ডাঁটা চচ্চড়ির বিভীষিকায় সে শিউরে শিউরে উঠ্‌তে লাগল।

মুখ নিচু করে' বিড়বিড় করছিল; চমকে চেয়ে দেখ্‌লে টেবিলের উপর খাবার দিয়ে গেচে ঃ—পোলাও, মাছের চপ, মাছের কালিয়া : কিসমিসের চাটনি : ছানার পায়েস !

তাড়াতাড়ি চামেলীর দিকে মুখ উঠিয়ে চাইলে। দেখ্‌লে কেউ নেই পাশে—দুষ্টু মেয়েটা কখন উঠে পালিয়ে গেচে।

পরক্ষণেই নেপথ্য থেকে হাসির একটা অফুরন্ত হিল্লোল ছুটে এল। এই হল চামেলীর কৌতুক !

চপ্‌টায় কামড় দিয়ে চেঁচিয়ে প্রশান্ত বল্লে—শীগ্‌গির এস মিলি, ডাঁটা চচ্চড়িটা চমৎকার হয়েচে। ঠাকুরের মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে !

—দুই—

বর্ষামঙ্গল

চামেলী বল্লে—দেখ, নিত্যি নিত্যি এমনতর শর্দ্দি করলে ভাল হবে না বলচি।

চায়ে চুমুক দিয়ে ধরা গলায় প্রশান্ত জবাব দিলে—হুঁ!...

'অদ্ভুত মানুষ, যা হোক্!' চামেলী বলতে লাগল, 'ছেলে মানুষের চাইতে বেশি অসাবধান,—একটু যদি খেয়াল থাকে; আশ্চর্য্য হয়ে যাই—'

পশমী গলাবন্ধটা দিয়ে গলায় আর একটা প্যাঁচ লাগিয়েই প্রশান্ত তাড়াতাড়ি জড়িত প্রতিবাদ করলে—বাঃ রে, ইচ্ছে করে' শর্দ্দি করেচি বুঝি?

'ইচ্ছে করে' নয়?' কৃত্রিম তর্জ্জন করে' বল্লে চামেলী, 'রোজ রোজ বৃষ্টিতে কে ভিজে আসে শুনি?'

'ওঃ—কিন্তু আমি তার কি করব?'

'তা তো বটেই,—মস্ত সমস্যা!—আচ্ছা দেখ, যার এখনও ইস্কুলে পড়া উচিত ছিল, তার আবার বাড়ির কর্ত্তা হ'তে সাধ কেন?' হতাশ হয়ে চামেলী বল্‌তে লাগল, 'ছাতাটা বাড়িতে আছে কার জন্য? আচ্ছা না হয় ধরলুম, ছোট ছেলেটার মাথায় প্রথমটা তা খেলেনি—কিন্তু আজ নিয়ে কদিন বল্লুম?'

তাও তো বটে। মনে রেখে চামেলীর উপদেশটা কাজে লাগালে এমন হাঁচি এবং পশমী গলাবন্ধটার এমন সর্ব্বনাশা অন্তরঙ্গতা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। কিন্তু এমন বলিষ্ঠ এক যুবককে ইস্কুলে পড়ার উপযুক্ত বলে চামেলী পরিহাস করবে, আর সে কি মুখ বুজেই তা হজম করে নেবে? পৌরুষ বলে কি একটা জিনিষ নেই?

'ছাতা?'

'ছাতা।'

'ছাতা দিয়ে কি হ'তো?'

'মাথায় দেওয়া যেত। ছাতা ব্যবহারটা এমন একটা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়—একটু দেখিয়ে দিলেই শিখ্‌তে পারতে।'

'স্যুটের ওপর ছাতা চড়িয়ে যেতে বল অপিসে—কী বিশ্রী!' প্রশান্ত স্বরটা অবজ্ঞার মত করবার চেষ্টা করলে।

ঠোঁট উল্টিয়ে একটু মুচ্‌কে হাসলে চামেলী; ভারি তার হাসি পেল কথাটায়—কত যেন ওনার বিশ্রী-সুশ্রী জ্ঞান। চামেলী না থাক্‌লে ওঁর সাজ সজ্জা দেখে হয় তো বা অপিসের চাপরাসীরা সেলাম করা বন্ধ করে' দিত;—আর তার কথাটা একবার শোন! বল্লে,—'ছাতা মাথায় দিলে বিশ্রী হলো কোথায়?'

'স্যুট পরে' মাথায় ছাতা?—দূর্ দূর্—ও পাড়াগাঁয়ে চলে। ধ্যেৎ, ও আমার দ্বারা কস্মিন্ কালেও হবে না। কোন ডিসেণ্ট লোকই—'

'কিন্তু ছাতা বেচারীর দোষটা কি মশায়?'

'অজস্র দোষ,—সে কি একটা দুটো? এমন হাঙ্গামাজনক অসুন্দর পদার্থ ত্রিভুবনে আর যদি একটা থাকে। আর কিছু যদি বৃষ্টি আট্‌কায়!'

'বৃষ্টি হলে ডিসেণ্ট লোকেরা তবে কি ব্যবহার করে?' মুচ্‌কে হেসে চামেলী জিজ্ঞেস করলে।

প্রশান্ত সগর্ব্বে বল্লে, 'কেন, বর্ষাতি,—ওয়াটারপ্রুফ্ কোট!'

সব্যঙ্গে চামেলী বল্লে, 'আহা, কী সুবিধাজনক পদার্থটা! বেশ তো, তবে তারই একটা কিনে নাও। সুবিধাজনক আর হবে না! ছাতার পাঁচগুণ দাম—হবেই তো!'

স্বর্গ

দারুণ একটা হাঁচির বেগ সামলাতে সামলাতে প্রশান্ত বল্লে, 'নাঃ, কিন্‌তেই হলো একটা বর্ষাতি। টাকা বাঁচাবার জন্য ছাতাটা ইয়ুস্ করতে গেলে শর্দ্দিতেই মর্‌তে হবে।'

বর্ষাতি কেনা হল। অথচ প্রকৃতির এমনই পরিহাস, আর এক ফোঁটা বৃষ্টিও কলকাতা সহরে পড়ে না। কাঁধে ফেলে প্রশান্ত সেটাকে নিয়ে যায় অপিসে, আর অপিস থেকে টেনে' বাড়িতে এনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কোটের কাঁধের দিক যায় কুঁচ্‌কে', দুদিন পরে পরেই বদ্‌লাতে হয় কলার, আর তা ছাড়া যে কাঁধ বর্ষাতিকে বহন করে, তার অবস্থা উঠ্‌চে শোচনীয় হয়ে। কিন্তু তা বলে আত্মসম্মানটা আর বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না; তাই চামেলীর সমুখে সেটাকে প্রশান্ত সগর্ব্বেই স্কন্ধে স্থাপিত করে' ছাতাকে বিদ্রূপ জানিয়ে অপিস যাত্রা করে। চামেলীর কৌতুকভরা চাউনিটাকে সে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করচে না, এমনতর তার ভাব।

কিন্তু মুস্কিল এই যে ও-কোটটা কাঁধে ফেল্‌লেই জল বের হবার উপক্রম হয় চোখে। ভাদ্র মাসের গরমের মধ্যে একটা ম্যাকিন্‌টস্ বয়ে বেড়ান নিশ্চয়ই আরামপ্রদ হয় না; অথচ দিনের পর দিন যায় পার হয়ে, আকাশটার কালো হবারও লক্ষণ নেই।

মনে মনে চামেলী বিস্তর হেসেচে। বুঝতে আর তার কিছুই বাকি থাকে নি,—কিন্তু প্রশান্তের পৌরুষকে উপযুক্ত শৌর্য্য দেখাতে সে বাঁধা দেয় নি। কিন্তু আজ কৃপা করে বল্লে—'যথেষ্ট বীরত্ব হয়েচে, এই গরমের মধ্যে আর ওটা বয়ে নিয়ে কাজ নেই।'

প্রশান্ত না দমে' বল্লে—না না, থাক্ ওটা সঙ্গে,—কখন বৃষ্টি নামে, বলাতো যায় না।

ট্রামে যেতে যেতে গভীর শ্রদ্ধাভরে পূব্ দিকে চেয়ে প্রশান্ত মনে মনে প্রার্থনা করলে,—বরুণ দেব, দাও, একটু বৃষ্টি দাও। এমন করে' অনাবৃষ্টি চল্‌তে থাক্‌লে চামেলীর কাছে আর সম্মান থাকে না। আর তাছাড়া,—জল না হলে শস্য টস্যই বা হবে কি করে?' অপিস থেকে যখন ফির্‌লে, তন্ন তন্ন করে খুঁজ্‌লে আকাশ, কিন্তু মেঘের একটু টুক্‌রোও পড়ল না তার চোখে।

কিন্তু সবচেয়ে ভাবনার কথা চামেলীর ব্যঙ্গ। বেশ, প্রশান্তের উঠুক ঘামাচি, তার জামা গেলই বা কুঁচ্‌কে', শার্ট ভিজুক ঘামে,—প্রশান্তের একটুও কষ্ট হয় না। কিন্তু চামেলী এমন ভাব কর্‌বে, যেন প্রশান্তের ভারি কষ্টই হচ্চে! এ যে স্পষ্ট ব্যঙ্গ, এতে প্রশান্তের আর

সন্দেহ নেই ; কিন্তু পৌরুষকে আর কি উপায়ে অধিকতর দীপ্যমান করে' তুলবে, ভেবেই পাচ্চে না।

সেদিন খবরের কাগজের ওপর থেকে মুখ না উঠিয়েই প্রশান্ত অত্যন্ত এক সহর্ষ উক্তি করলে। চামেলী পাশের চেয়ারে বসেই চায়ের পেয়ালায় চিনি মিশাচ্ছিল, বল্লে, ব্যাপার কি ?

প্রশান্ত থতমত খেয়ে গেল। ইচ্ছে হল, সত্য কারণটা চাপা দিয়ে অন্য যাহোক্ একটা কিছু বল্‌বে ; কিন্তু এমন আকস্মিক প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না, সত্য কথাটাই বলে ফেল্‌তে হল।

বল্লে, আবহাওয়ার অপিসের সংবাদ, চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর থেকে ঝড় আর মেঘ যাত্রা করেচে এদিকে,—কলকাতায় বৃষ্টি আজ হবেই। যাক্,—এতদিন পরে আমার,—তোমার গিয়ে, সহরটা একটু ঠাণ্ডা হবে।'

চামেলী অবজ্ঞাভরে বল্লে, 'আবহাওয়া অপিসের সংবাদ ? তবে তো স্বয়ং ইন্দ্রদেবের স্পেসাল কেব্‌ল্। তোমার সমস্ত ঘামাচি মরবে এবার !'

সেদিন ছুটীর পর আশান্বিত হয়ে বের হয়ে এসে হতাশ হয়ে প্রশান্ত আবিষ্কার করলে, কটমট করে'

তাকিয়ে আছে কাঠফাঁটা রৌদ্র। মনটা বড়ই দমে গেল,—কিন্তু বিজ্ঞান ভুল হবে, তা তাঁর বিশ্বাসই হল না। সিদ্ধান্ত করলে,—বৃষ্টি এল বলে,—বড় জোর আর এক ঘণ্টা। তখন বর্ষাতি মহানন্দে গায়ে পরে' বুক ফুলিয়ে প্রবেশ করবে বাড়িতে; একবার দেখ্‌বে, কোথায় যায় চামেলীর এমন ব্যঙ্গ-বর্ষী চাউনিটা।

বৃষ্টির আশায় তিনতিনটে ঘণ্টা অভুক্ত অবস্থায়ই ময়দানে দিলে কাটিয়ে। কিন্তু কোথায় বৃষ্টি? বঙ্গোপ-সাগরের ঝড় ও মেঘ সুন্দরবনে পথ হারিয়ে গেল নাকি? রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে প্রশান্ত আবিষ্কার কর্‌লে, আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে গিয়েছে। তারাগুলোকে আজ সর্ব্বপ্রথম বসন্তের ক্ষতচিহ্নের মত মনে হতে লাগল।

সত্যকথা বল্‌তে কি, প্রশান্তের অবশেষে এই নিতান্ত নিরপরাধ বর্ষাতিটার ওপরই রাগ হতে' লাগল।

পরের দিন অপিসে যাবার আগে জান্‌লা দিয়ে বাইরেটা দেখে প্রশান্তের বসে পড়বার মত অবস্থা। প্রখর রৌদ্রে সবকিছু দেখাচ্চে ধূঁয়ার মতন; আর কি বদরকম একটা গরম পড়েছে। এর ওপর গলায় পর্‌তে হবে দাড় আর কাঁধে টান্‌তে হবে বর্ষাতি!

চামেলী যদি ভাঁড়ারে বা অন্য কোথায়ও ব্যস্ত থাক্‌তো, তবে না হয় যেতই বর্ষাতিটা ফেলে; বাড়ি ফিরে বল্‌ত, বিষম ভুল হয়েছিল তার। কিন্তু চামেলীর অন্য দিকে যাবার একটু সম্ভাবনাও দেখা গেল না।

হতাশ হয়ে প্রশান্ত বল্লে,—'রস্গোল্লা বানাবে বলেছিলে না, মিলু; যাওনা লক্ষ্মীটি, এইবেলা চট্‌পট্‌ সেরে নাও গিয়ে।'

'সে এখন কি ?' ভুরু কুঁচকে' বল্লে চামেলী।

'স্নানের আগেই সেরে ফেলা ভাল।'

'হয়েচে,—খুব হয়েচে। এবার অপিসে যাও তো—কাজ তোমায় আর শেখাতে হবে না।'

'তবে আর মিছিমিছি দেরি করচো কেন, স্নানটা করে' এস।'

'স্নান? এখন ? কটা বেজেচে বলতো ?'

হতাশ হয়ে প্রশান্ত বর্ষাতিটার দিকে হাত বাড়ালে।

চামেলীর করুণা হলো। বল্লে, ওটা না হয় আজ্‌কে থাকুক।

প্রশান্ত জবাব দিলে না, কিন্তু গভীর উৎসাহের সঙ্গে বর্ষাতি পাট্‌ করতে লাগল।

'এই রৌদ্রের মধ্যে কেন মিছিমিছি নিয়ে যাচ্ছ।--সত্যি বলচি, রেখে গেলে, আমি ঠাট্টা করবো না।'—চামেলী মৃদু হেসে বল্লে।

প্রশান্তের পৌরুষ আহত হল। বল্লে—যেন কারুর ঠাট্টার ভয়েই ওটা নিই!

'তবে?' স্মিতমুখে বল্লে চামেলী।

'বেশ, তবে নিলুম না,—এই রেখে গেলুম।' প্রশান্ত বর্ষাতিটা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে, 'ঠাট্টায় ভয় পাই আমি?'

বর্ষাতি বিমুক্ত হয়ে অত্যন্ত পুলকিত স্বচ্ছন্দে প্রশান্ত গেল আফিসে, এবং অপিসের পরে ভিজে' ভূত হয়ে ফিরল বাড়ি! আকাশ যেন তার সঙ্গে পরিহাস স্থুরু করেছে। বর্ষাতিটা এতদিন তার কাঁধের চামড়া ফেল্ল উঠিয়ে, কোথায় ছিল বৃষ্টি? আজ যেই সেটাকে রেখে গেল, আকাশের দরজা অমনি গেল খুলে। এমন শত্রুতার কথা আর শোনা যায় নি।

বর্ষাতি আবার নিয়মিত ভাবে অফিসে নেওয়া আনা হ'তে লাগল। কিন্তু বৃষ্টি অমনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে' বন্যা সৃষ্টি করতে গিয়েচে বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায়। বন্যার খবর কাগজে পড়ে' প্রকৃতির এই নির্ম্মম পরিহাসে

প্রশান্ত দাপাতে থাকে। এত জল, জলের জন্য এত কষ্ট চারদিকে, অথচ তার বর্ষাভিটার জন্য একফোঁটা নেই জল! প্রশান্তের যা মনের অবস্থা, তাতে যদি সে গলা দিয়ে সাতটা সুর বার করতে পারত, তবে মেঘমল্লার রাগ শিক্ষা করতে কোন ওস্তাদের কাছে যেতে পারত, কিন্তু গোড়ায়ই তার গলদ। ইতিমধ্যে একদিন গরীবদের দুআনা পয়সা দান করে' মনে মনে সে বলেছে,—'ঈশ্বর, দান করার দরুণ আমার যা পুণ্য হলো, তার জন্য শুধু মাত্র এক পশলা বৃষ্টি চাই,—আর কিছু নয়।' কিন্তু ঈশ্বর তা শোনে নি।

অপিসে যাবার পথে প্রশান্ত জোর করে' বল্লে,—আজ ভিজতেই হবে।'

আকাশে তখন রৌদ্রের আগুন লেগেচে,—মেঘের বংশও দেখা যায় না।

প্রশান্ত বল্লে,—আজ ভিজতেই হবে। আর চালাকি নয়,—এমন করে' আর থাকা যাচ্চে না—

ট্রামে প্রশান্তের ঠিক সমুখের আসনেই যিনি বসেছিলেন, তার কাগজে দেখা গেল হাওয়া-অপিসের খবর—'কলকাতায় শীঘ্র বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

প্রশান্ত বল্লে,—বর্ষাতিটা গায়ে পরে' আজ ভিজতেই হবে—যেমন করেই হোক্।

সারাদিন সারা সন্ধ্যা সমস্ত কলকাতায় এক ফোটা বৃষ্টি পড়লে না, কিন্তু সন্ধ্যার পরে যখন প্রশান্ত বাড়ি ফিরল, ভেজা টুপি, বর্ষাতি থেকে অজস্র ধারায় ঝরচে জলের ধারা, ভিজা জুতো প্যাচ্‌প্যাচ্‌ করচে।

চামেলী তো অবাক্। বল্লে,—এ কি ?

'আর কি, বৃষ্টি। উঃ, কী দুর্যোগ ওদিকটায়'—ভিজা বর্ষাতিটা টেনে খুলতে খুলতে প্রশান্ত বল্লে।

'দুর্যোগ ! কোন্ দিকে ? বিস্মিত হয়ে চামেলী শুধালে, 'সত্যি বলছি, এদিকে তো এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি।'

'তাই দেখে তো অবাক হলুম। অথচ শ্যামবাজারে কি বৃষ্টিটাই হয়ে গেল। একেবারে জল দাঁড়িয়ে গেচে। —ভাগ্যিস ছিল বর্ষাতিটা, নইলে –

ভিজা জুতোজোড়া প্রশান্ত টেনে খুলে ফেল্লে। চামেলী ছোট্ট একটা খুকীর মত সহর্ষে বল্লে, 'কলকাতায় এইটে ভারি মজার। একদিকে হয়তো দারুণ বৃষ্টি হয়ে গেল, অন্য দিকে একেবারে শুক্‌নো।—এমন আর কোথাও হয় না।'

'যা বলেচ, মিলি',—ঘরের ভিতর থেকে প্রশান্ত জবাব দিলে, 'ধর্ম্মতলার এদিকটা একেবারে ঠন্‌ঠন্ করচে। অথচ ওদিকে বন্যার কাছাকাছি। বর্ষাতিটা না থাক্‌লে আজ জ্বর আটকায় কার সাধ্য।'

চামেলী তাড়াতাড়ি গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে। এবং বিজয়গর্ব্বে গৌরবান্বিত প্রশান্ত স্নানের ঘরে ঢুক্‌ল।

উপরে ঠাকুরকে উপদেশ দিয়ে চামেলী নিচে নেমে এল ঘরে। শুনতে পেল সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ—কৌতূহলের সঙ্গে ওদিকে তাকিয়েই বল্লে—ওঃ ছোড়দা, —এস, এস।—তবু রক্ষে ভুলে যাও নি।'

চামেলীর ছোড়দা সুধীর থাকে মেসে। কেন যে তার সর্ব্বক্ষণ এক আন্তরিক ব্যস্ততা তার কারণ কেউ জানে না—কিন্তু চামেলীর বাড়ি রীতিমত আসবার সে সময় পায় না—এমনি নাকি সে ব্যস্ত।

'জানিস্ তো মিলি', সুধীর ঘরে প্রবেশ কর্‌তে কর্‌তে বল্লে, 'নানান্ কাজে থাকি। তাছাড়া ভাব্‌চি,—মায়া আর বাড়াব না,—ফাইন্যালটা দিয়েই দিই ; আর নানান রকম সব কাজ।'

চামেলী অভিযোগ ক'রে বল্লে, কী যে তোমাদের এত কাজ ভেবেই পাই না ; তোমার জুতো বাইরে রেখে

এস বাপু ছোড়দা ; ভেজা জুতায় আমার কার্পেট নষ্ট করবে।

সুধীর বিস্মিত হয়ে বল্লে,—'ভেজা জুতো! জুতো আমার ভিজ্‌তে যাবে কেন!'

'শ্যামবাজার থেকে আসচ তো!'

'হ্যা।'

'কখন বেরিয়েচ?'

'বাস্‌এ বরাবর এলুম।'

'বৃষ্টি হয়নি ওদিকে!'

'বৃষ্টি? বৃষ্টি আছে নাকি কলকাতায়।' সুধীর বল্লে, 'শ্যামবাজারে বৃষ্টির জন্য যজ্ঞ হচ্চে দেখে এলুম।'

'ওঃ, বুঝতে পারচি'—কৌতুকস্মিত হাস্যে চামেলীর মুখটা একেবারে ভরে গেল ; চোখটা বাঁকিয়ে স্নান ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে দেখলে একবার, কিছু তার বুঝতে বাকি রইল না। মনে মনে বল্লে,—'অদ্ভুত মানুষ যাহোক্।'

গা ধুতে প্রশান্তের সেদিন লাগল দেড় ঘণ্টারও ওপরে।

স্বর্গ

সে রাত্রে প্রশান্ত অবশেষে বললে—'ওটা বেচেই ফেলব, ঠিক করলুম।'

'কোনটার কথা বলচ?' চামেলী প্রশ্ন করলে।

'বর্ষাতি', গম্ভীর স্বরে প্রশান্তের জবাব।

চামেলী বল্লে, 'পাগল হয়েচ! ওটা বেচবার মতন কি অভাবটা পড়েছে তোমার? তবে দয়া করে' কলের জলে অমন করে' জুতো আর টুপি ভিজিয়ে এসো না, লক্ষ্মীটি, —ছিঃ।'

'নাঃ, বেচবই,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্লে প্রশান্ত।

'কত টাকাই বা তাতে পাবে?'

'তা গোটা তিন বা সাড়ে তিন কি আর পাব না?'

'পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনে তাতে বড়ই লাভ হবে!' চামেলী গৃহিণীর দূরদর্শিতার সঙ্গে বল্লে, 'পাগলামি করো না—আর মাইরি বলচি, বর্ষাতি নিয়ে আর কোনও দিন যদি আমি কিছু বলেচি!'

প্রশান্ত ভাব্‌লে, মুখে কিছু নাই বলুক, চোখ তো আর বন্ধ রাখা যাবে না। চাউনিটাই তো আদত ভয়ের। বল্লে—নাঃ, বেচবই।

পরদিন প্রশান্ত এক পুরান-জিনিষের দোকানে নগদ দুই টাকা সাড়ে এগারো আনা দামে বর্ষাতি এল বিক্রি করে ; এবং তার ঠিক পরদিনই কলকাতায় সত্যিকারের বর্ষা স্থরু হলো।

—তিন—

আর্শি

চামেলীর জ্বর হয়েচে দুদিন ধরে'। বেচারী প্রশান্তের দুশ্চিন্তার আর অবধি নাই। দুবার করে' দিনে ডাক্তার আসচে, কিন্তু মুস্কিল হল এই যে চামেলী না খাবে ওষুধ, না ছোঁবে রোগীর পথ্য।

'তেতো ওষুধ কে খাবে ? আমার খেতে বয়ে গেচে।'

'কি ছেলেমান্‌ষি করছ, বলতো মিলু', প্রশান্ত হতাশ হয়ে বল্লে, 'আচ্ছা, এই দাগটুকু খেয়ে নাও, আর বল্‌ব না।'

ডাক্তার চৌধুরি এসে যখন এর পর বুক পরীক্ষা করে' বলে গেলেন, চামেলীর হার্ট দুর্ব্বল, তখন প্রশান্ত চোখে অন্ধকার দেখল। পীড়াপীড়ি করে' যে ওষুধ বা পথ্য খাওয়াবে, সে সাহসও তার রইল না। সামান্য মানসিক

উত্তেজনার সৃষ্টি হলে চামেলীর ক্ষতি হ'তে পারে, এই ভয়ে সে তটস্থ হয়ে রইল।

ডাক্তারকে অবস্থার জটিলতাটা জানান হল। তিনি এসে চামেলীকে বিস্তর বুঝালেন। একটা নতুন ওষুধ প্রেসক্রুপ্‌সান করে' বল্লেন—এতে মেশানো আছে আঙুরের রস, একটু তেতো লাগবেনা, এর গন্ধ হবে চমৎকার, ওষুধ বলে মনেই হবে না একে। আর যা অমোঘ ওষুধ এটা, এক শিশি শেষ হবার আগেই জ্বর ত্রাহি বলে দেবে চম্পট।

চামেলী বল্লে—'উনি যদি জোরাজুরি না করেন, তবেই আমি খাব। ইচ্ছে মতন নিজ হাতে ঢেলে নেব; উনি ছুঁতে এলেই কিন্তু আর খাব না, আগে থেকেই বলে দিলুম।'

ডাক্তার বল্লেন—বেশ তাই হবে। ছোঁবেন না উনি। কিন্তু নিজে খেতে ভুলবেন না যেন।

ঠিক তারপর দিনই জ্বর গেল চলে। ডাক্তার এসে খুসি হয়ে বল্লেন—'কেমন, দেখলেন তো? বলেছিলুম কিনা?' প্রশান্তকে বল্লেন—'এটাই চলুক—অব্যর্থ ওষুধ এটা।'

প্রশান্ত খুসি হয়ে বল্লে—'সত্যি এটা miracleএর কাজ করেচে।'

চৌধুরি বল্লেন—'বিলেতের হাঁসপাতালে ডাঃ বোডেনের ছিল এটা favourite প্রেসক্রপসান; তার কাছেই শিখেছিলুম। কেমন, খেতে মিষ্টি নয়?'

চামেলী ঘাড় নেড়ে বোঝালে—'অত্যন্ত চমৎকার!' কিন্তু বড্ড কাশি আসে বলে কাশ্‌তে কাশ্‌তে সে চাদর দিয়ে নিজের মুখে চেপে ধরলে।

কিন্তু জ্বর গিয়েই হলো আরও মুস্কিল। দুধ বার্লি আর সে ছোঁবে না; বায়না ধরলে, ভাত খাবে আজই—ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে।

'ক্ষেপেচ', প্রশান্ত বল্লে, 'চারদিন পরে আজ ভোরে মাত্র ছাড়ল জ্বর, আজি ভাত খেতে চাও!'

'বাঃ রে, খাবনা কেন? জ্বর তো নেই।'

'আবার আস্‌তে কতক্ষণ।'

'কেন, ডাক্তার চৌধুরীর অমোঘ মিক্‌শ্চার তো রয়েইচে। এলোই বা—ভয় কিসের।'

'লক্ষ্মীটি, ছেলেমানুষি করো না।'

চামেলীকে পথ্য খাওয়ানোতে ধৈর্য্যের অগ্নি পরীক্ষা হয়ে যায়। অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশ, ক্রোধ, অসন্তুষ্টি, অভিমান, কিছুই আর বাদ দেওয়া যায় না। আজ দুধ বার্লির পেয়ালাটা চামেলীর সাম্‌নে .

৩৭০

ধরে' প্রশান্ত ভিতরকার হতাশাটা কোন প্রকারে চাপ্‌তে লাগল। চেয়ারে বসে বাঙ্‌লা মাসিকটা চোখের সাম্‌নে উঠিয়ে বিজ্ঞাপনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আড় চোখে দেখ্‌তে লাগল চামেলীর মুখবিকৃতির নানা বিচিত্র ভঙ্গী। এমন অদ্ভুত সুন্দর, এমন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ভরা যে মুখবিকৃতি হ'তে পারে তা কল্পনাতে প্রশান্ত ভাব্‌তে পারে নি। চামেলী অবজ্ঞাতে ওল্টাচ্চে একবার ঠোঁট, জিব্‌টার প্রত্যন্ত ভাগ বের করে' ভাঁজ করে জানাচ্চে বিরাগ, চোখ দুটো স্তিমিত করে' নাকটা কুঞ্চিত করবার করচে চেষ্টা, ঘাড়টা বাঁকালে একবার, কাঁধটা বিরাগের ভঙ্গিতে বেঁকিয়ে একদিকে-হেলান গালের সঙ্গে লাগাচ্চে।

যেখানে গম্ভীর হওয়া দরকার, প্রশান্তের সেখানে হাসি ফুঁড়ে বের হবার জোগাড় হল।

বিজ্ঞাপনের পাতায় সহসা পড়ল তার চোখ। সোৎসাহে সে বল্লে—'এই দেখ, মিলি,—কেমন সুন্দর মেয়েটী—যেমন দেখতে, তেমনি স্বভাব। চেয়ে দেখ একবার তুমি। অসুখ হয়েছিল, সেরে গেচে ; কিন্তু কেমন লক্ষ্মীটির মতন, সাগ্রহে সানন্দে পূরা একটা গেলাস দুগ্ধহীন বার্লি খাচ্চে, একবার তাকিয়ে দেখ।' বলে বার্লির বিজ্ঞাপনে যেখানে এক তরুণী মেয়ে খুসি-ভরা

মুখে বার্লির গেলাস নিঃশেষ করচে, সেটা চামেলীর সমুখে মেলে ধরল। হেসে বল্লে,—'একে যদি বিয়ে করতাম, তবে কি সহজেই বার্লি খাওয়ান যেত।'

'জন্মে ও যেত না'—অবজ্ঞা ভরে বিজ্ঞাপন সরিয়ে বল্লে চামেলী।

'কেন!' প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলে।

'ও যে ছবি। ছবি বুঝি খেতে পারে।'

'আহা, ছবি কেন হবে,—সত্যিও অমন আছে, তাই তো এঁকেছে।'

'ছাই আছে', হেসে বল্লে চামেলী 'সত্যি মানুষ আবার খুসি হয়ে বার্লি খেতে পারে নাকি?'

চামেলী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠেচে। কিন্তু প্রশান্তের সাবধানতার অন্ত নেই। ডাক্তার চৌধুরির কাছে সে গেল জিজ্ঞেস করতে কোনও টনিক চামেলীকে দেওয়া চত কি না।

'আমার মিকশ্চারটাই চলুক আর কদ্দিন। ওটা টনিকও বটে। আশ্চর্য্য ওষুধ—মন্ত্রের মত কাজ করে জ্বরে, এবং জ্বরের পরের দৌর্ব্বল্যে। বোডেন সাহেবের আমরা যারা ছাত্র তারাই শুধু জানি।'

'আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে খুবই তাড়াতাড়ি ফল দিয়েচে।' প্রশান্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বল্লে।

'ওটা সীরিয়াস কেস হ'তে পারত মশায়', ডাক্তার চৌধুরি বল্লেন, 'টাইফয়েডের সমস্ত সিম্পটমের পূর্ব্বাভাস পেয়েছিলাম। শুধু ঐ মিক্‌শ্চারের গুণেই আট্‌কে গেল।'

এক শিশি মিকশ্চার তৈরী করে' নিয়ে তবে প্রশান্ত বাড়ি ফিরল। মিক্‌শ্চারের সেই শিশি দেখেই তো চামেলী চটে' আগুন।

'ঐ আল্‌কাতরা ওষুধ-গুলো আবার কার জন্য? কৈ, তোমার জ্বর হয়েচে, আমায় বলো নি তো।'

'তোমারই জন্য', প্রশান্ত সামান্য আশঙ্কিত হয়ে বল্লে, 'মানে, ডাক্তার চৌধুরি বল্লেন—'

'ডাক্তার চৌধুরির নিকুচি করেচে। কি হবে ও দিয়ে?' ভুরু পাকিয়ে বল্লে চামেলী।

'জ্বরের পরেও নাকি, এ খুবই উপকারী।'

'আর জ্বরের সময়?'

'সে তো তুমি দেখ্‌তেই পেয়েচ; তার অভিজ্ঞতা তো তোমার নিজেরও আছে।' প্রশান্ত সগর্ব্বে বল্লে।

'তবে দাও', হাত বাড়িয়ে চামেলী নিলে শিশিটা; এবং কাল বিলম্ব না করে' পাশের ড্রেনেতে সমস্তটা ঢেলে দিলে।

'ওকি ছেলেমান্ষি, মিলি,' বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলে প্রশান্ত।

'জ্বরের সময়ে এ-ওষুধ জান্লা গলিয়ে ফেলে দিয়েই তো ভাল হয়েছিলুম,' দুষ্টু মৃদু হেসে বল্লে চামেলী, 'আর খেতে যাব জ্বরের পরে? অভিজ্ঞতাকে কি একটুও সম্মান করবো না?'

'বলো কি?' প্রশান্ত হতভম্ব হয়ে বলল।

'দিতামই তো ওষুধ ফেলে; এক এক দাগ করে। আমার বয়ে গিছ্‌ল আলকাঁত্‌রাগুলো গিল্‌তে। মানুষের বুঝি ঘেন্না করে না!' চামেলী অপাঙ্গে তাকিয়ে বল্লে।

জীবন মৃত্যুর উপরে যে মানুষের হাত নেই, তাতে প্রশান্তের গভীর বিশ্বাস হ'ল।

রাতে শুয়ে চামেলীকে ডাক্‌লে,—মিলি।

'কি?'

'অমন করে' ওষুধ ফেলে দিতে—ধর, যদি অসুখ বেড়ে যেত!'

'যেত যেত, বয়ে গেল', চামেলী জবাব দিলে।

'অসুখকে ভয় করো না?'

'একটুও না।'

'তবে সেবার আমার ম্যালেরিয়ায় অত ভয় পেয়েছিলে কেন ?'

'সে তো তোমার অসুখ', বলে চামেলী ওদিকে ফিরে শুলে। দেওয়ালের কাছের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় প্রশান্ত দেখ্‌তে পেল চামেলীর অপ্রতিভ মুখটার ছবি। আর কোনও সে প্রশ্ন করতে পারলে না।

—চার—

বাসর

'ওগো শুন্‌চো ?'—চামেলী বল্লে।

প্রশান্ত প্রথামত বইয়েতে মুখ গুঁজে পড়চে। কিন্তু তার কান সতর্ক রয়েচে, যাতে প্রশ্নের জবাব না পেয়ে চামেলী তার ঔদাসীন্যে চটে উঠ্‌তে না পারে।

'কি ?' বই থেকে মুখ সরিয়ে সে বল্লে।

'মাসের আজ ক' তারিখ ?' চামেলী তার দীর্ঘসুন্দর চোখের পক্ষ্ম উর্দ্ধায়িত করে জিজ্ঞেস কর্‌লে।

'তেরো।'

'দূর, ইংরিজি নয়, বাংলা মাসের।'

'ঐ তো ঠেকালে', বলে প্রশান্ত হাতের বইটা টেবিলের উপর স্থাপন করল।

'ইংরিজি মাসের তারিখ তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করতেই বা যাব কেন ? মাসের পয়লা থেকে তার পিছু ধাওয়া করি।'

'সে বেচারীরা দূরদেশ থেকে এসেচে ; তোমার কি ক্ষতিটা করলে, মিলু ?'

'গেলে যে উপকার করে।'

'তা করে বটে।'

'মাসে সত্যি দুবার মাইনে দেওয়া উচিত ছিল—একবার ইংরিজি মাসের পয়লা ঃ আবার বাঙলা মাসের পয়লা। তা হলে কি বাঙলা মাসের তারিখ জিজ্ঞেস করলে ঠকে যেতে তুমি?'

'না, যেতুমই না তো', প্রশান্ত সোৎসাহে বল্লে, 'নিশ্চয়ই দুবার করে' মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। তাতে বাংলা মাসের কত কদর বেড়ে যেতো।'

চামেলী একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে নিলে একপাশ ফিরে। তারপর বল্লে—'অর্দ্ধেক মাইনে এ মাসের পয়লা, অর্দ্ধেক মাইনে ও মাসের পয়লা; তাই না?'

হতাশ হয়ে প্রশান্ত বল্লে—দূর, তা নয়।

'এক পয়লা ফাগুনে কার কি হয়েছিল? চামেলী—কৃত্রিম নির্লিপ্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করলে। 'মনে করতে পারচিনা, বলে দাও না?'

প্রশান্ত চমকে উঠে বল্লে—ওঃ, তাই তো, খেয়ালই ছিল না। মাঘ মাস প্রায় শেষ হয়ে এল, তাই না?

'এল', চামেলী বল্লে।

'ক বছর হল, মিলু?'

'তা বছর কুড়ি হবে না গা ?' চামেলী গম্ভীর হয়ে বল্লে।

'তা বৈকি, আমার তো মনে হচ্চে, এখনও বিয়ে হয়ই নেই—শুধু মাত্র পূর্ব্বরাগের পালা চলচে।'

'বটে ? তোমার কোর্টশিপ হচ্চে মাত্র ?' দুষ্টু হাসিতে তার তনুদেহটা লীলায়িত করে চামেলী বল্লে—'বিয়েটা হচ্চে কবে ?'

'আসচে পয়লা ফাগুন', প্রশান্ত জবাব দিলে।

নববসন্ত প্রথম পদক্ষেপ করল ধরায়—দক্ষিণমেরুর থেকে হাওয়া এল অগ্রদূতের মতন। কেটে গিয়েচে শীতের জড়তা : এক নিমেষে তরুণ যাদুকর যৌবনের মন্ত্র পড়ে দিল আচ্ছন্ন ধরণীতে। ফুলেতে, বাঁশিতে, চাঁদেতে, নতুন স্বপ্ন বোনা সুরু হয়েচে।

'মিলি ?'

'হুঁ।' অপর খাট হ'তে চামেলী শুয়ে শু'য়ে জবাব দিলে।

'ফর্সা হয়ে গেলেই পয়লা ফাগুন।'

'ইংরাজি মাসের কত ?' চামেলী নির্দ্দোষ সরলতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে!

'দুত্তরি ইংরিজি মাস। আজ আর কিছু নয়, শুধু পয়লা ফাগুন।'

'তা বেশ।'

'ভোর হয়ে গেলেই আমাদের দুজনের দেখা হওয়া নিষেধ।'

'কেন?'

'তুমি হলে কনে, আমি বর। বিয়ের আগে দুজনের দেখা হবে? ছিঃ!'

'বিয়েটা দেবে কে? পুরুত ও আনবে নাকি?' একটু দুষ্টু কটাক্ষ করে চামেলী বল্লে।

'পুরুত প্রজাপতি স্বয়ং। কিন্তু বাসরঘরটা তুমি সাজিয়ে রেখো। সেই বাসর ঘরে জাগবে তুমি আর আমি। আর কেউ নয়।'

'কিন্তু তোমার কনে যে ধাড়ী হয়ে গেচে, তার কি?'

'আমার কনে থাকবে চিরদিনের কনে—অনন্ত-যৌবনা সে।'

'ভোরের চা-টা তা হলে বাইরে ঘরে একা একাই সারবে?'

'না করে উপায় কি? স্ত্রী আমি সন্ধ্যার আগে পাব কোথায়?'

সারাটা প্রভাত তারা দেখা করলে না। বাইরের ঘরেই আহার সেরে, চাকরকে দিয়ে পোষাকপত্র নিয়ে

বাইরের ঘর থেকে প্রশান্ত অপিসে চলে গেল। এদিকে হাসতে হাসতে চামেলীর নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসবার জোগাড়।

প্রশান্ত যখন বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েচে। মুটের মাথায় করে নিয়ে এসেচে বিস্তর ফুল—চামেলী, বেল, গোলাপ, রজনীগন্ধা। পাঠিয়ে দিল ভিতরে। নিজে বাইরের অপিস ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বনমল্লিকার মত উঠেচে জোৎস্না। লেগেচে আবেশ সমস্ত রাতের মধ্যে। যেন নেশা লেগেচে প্রশান্তের মনে। তিন বৎসর আগে এক পয়লা ফাল্গুনে মনের মধ্যে যে বিচিত্র অনুভূতিগুলি স্বপ্ন মেলে ধরেছিল, প্রশান্ত আভাস পেল তাদের।

অনিচ্ছুক হাতে সুইচটা টিপে আলোটা জ্বালালে। দেখলে—চামেলী চেয়ারের হাতলে পরিপাটী করে সাজিয়ে রেখে গেছে গরদের নক্সি পেড়ে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, চাদর, নতুন কেনা চক্‌চকে স্যাণ্ডেল; কাচের পাত্রে শ্বেতচন্দন। সাবান, তোয়ালা, আয়না, চিরুণী,—যা কিছু প্রয়োজন হতে পারে, সবই প্রস্তুত আছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল অনেক্ষণ। ভাব্‌লে—চামেলী

সত্যি যদি না থাক্‌তো, এমন সুব্যবস্থা কল্পনা করাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

চাকরকে হাঁক দিয়ে প্রশান্ত স্নানের জোগাড় কর্‌তে বললে। স্নানান্তে বামুনঠাকুর বিস্তর খাবার দিয়ে গেল—একা রসে বসে প্রশান্ত কোনও রকমে আহার সেরে নিলে। চাকর আর ঠাকুর দুজনকেই বায়স্কোপের পয়সা দিয়ে বল্লে—যাও, দেখে আস গিয়ে ছবি। সৌভাগ্যকে শত ধন্যবাদ দিয়ে তারা ছুট্‌ল বায়স্কোপ দেখ্‌তে। প্রশান্তের পক্ষে নির্ব্বিঘ্ন বাসরযাপন সম্ভবপর হল।

রাত নটা বেজে গিয়েচে। জ্যোৎস্না একটুও ম্লান হয়নি,—শুধু বেড়েছে তার আবেশ। ওদিকের সরু বারান্দাটায় কৃষ্ণচূড়া ডালের ছায়া পড়ে চিত্র আঁকা হয়েচে। সেই আলপনার উপর পা ফেলে ক্ষৌমবস্ত্রপরা চন্দনলিপ্তললাট প্রশান্ত বাসর ঘরে যাত্রা করেচে।

অত্যন্ত মৃদু করে' দরজাটা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলে। পদ্মের মত একটা ঝাড় প্রতিদিনের বিজলী-বাতির চিমনিটাকে বেষ্টন করে' রঙিন আলোক বিকীর্ণ করে' সমস্ত প্রকোষ্ঠের চেহারা বদ্‌লে দিয়েচে। অগুরু ধূপের গন্ধে ভরে আছে বাতাস। ঘর জোড়া গালিচাটাকে

অনুসরণ করে সে দেখ্‌লে, ঘরের অপর প্রান্তে দুধের মত শাদা বিছানায় আভূমি ঘোমটা টেনে, বেনারসী শাড়ির রহস্যে ঘন-আবৃত হয়ে একটা স্পন্দমান কাপড়ের পুঁটলি কর্‌চে অপেক্ষা। প্রশান্তের দুই ঠোঁট প্লাবিত করে' হাসি এল চামেলীর এই অরিজিন্যালিটী দেখে। সন্দেহ রইল না, এ প্রকৃতই কনে বটে।

'শুনচেন?' প্রশান্ত গলায় যথাসাধ্য নতুর-বর-সুলভ দ্বিধাভীরুতা মিশিয়ে বল্লে।

কোনও জবাব এল না, শুধু গুণ্ঠিত মস্তকটা মাটীর দিকে আরও ঝুঁকে পড়ল।

'দেখুন, মানে—একটু শুন্‌বে?' শোনা দূরের কথা, লজ্জায় নতুন বধূ এক পাশ ফিরে বস্‌লে।

'ছিঃ! বরকে এত লজ্জা করে! ঘরে অন্য কেউ থাক্‌লে না হয় আলাদা কথা ছিল।' প্রশান্ত উপদেশ দিল।

কোনও ফলোদয় হল না। কনে গভীর ব্রীড়ায় তার দিকে পিছন ফিরিয়ে বস্‌লে এবার।

প্রশান্ত অগ্রসর হয়ে তার নিকটতর হল। বল্লে—'শুন্‌চো, তোমার হাতটা বের করে দাও,—পাণিগ্রহণটা হয়ে যাক্‌।'

তেমনি নীরব, নিশ্চুপ।

'পাণিগ্রহণ না করলে বিয়েই যে সিদ্ধ হবে না', প্রশান্ত বল্লে।

'বাঃ রে, নিজে নিজে হাত বের করে' দিতে আমার লজ্জা করে না বুঝি ?'—এতক্ষণ পরে কন্যা স্খলিত কণ্ঠে জবাব দিলেন।

'কিন্তু তোমার চতুর্দ্দিকে যে বেনারসের দূর্গ বানিয়েচ।'

'এই তবে নিক্,' ভাববাচ্যে জবাব দিয়ে কনে হাতটা বের করে দিলে।

প্রশান্ত গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে তার হাতটা গ্রহণ করে' তাতে একটু চাপ দিয়ে বল্লে—'ইয়ে, তোমার গিয়ে নামটা জানি কি !'

'বাঃ রে, জান না বুঝি ?'

'তোমার মুখেই না হয় শুনলুম।'

'শ্রীমতী হিড়িম্বারাণী,' কন্যা ভীত কম্পিত-স্বরে বল্লেন, 'তোমার ছি-চরণের দাসী।'

'তা হিড়িম্বা দেবী, ঘোমটাটা একটু ওঠাবে—না ঘরের মধ্যেও দ্বিতীয় অন্তঃপুর বানিয়ে থাক্‌বে ?' বর প্রশান্ত বল্লে। বলে' বহু চেষ্টায় বেনারসী শাড়ির

নাগপাশ থেকে কনের মুখপদ্ম মুক্ত করলে। শ্রীমতী হিড়িম্বারাণী মুদে' আছেন দু চোখ গভীর ব্রীড়ায়, অপূর্ব্ব সুন্দর মুখটার সর্ব্বত্র চন্দনের পত্রলেখা চিত্রিত, দুলচে উজ্জ্বল কর্ণাভরণ, চূর্ণ অলকগুচ্ছ উড়চে পাখার হাওয়াতে।

'একটু তাকাবে?'

ধীরে ধীরে কনে চাইলে চোখ মেলে। যেন বিকশিত হল পদ্মের কলি, যেন জ্যোৎস্না এল নদীর বুকে। কিন্তু একটু হাসলে না চামেলী,—এমন চমৎকার অভিনয় সে করতে পারে যেন অভিনয়ই করচে না।

'চেয়ে দেখ্‌লে তো,—এইবার বল, আমাকে কি পছন্দ হয়েচে?' প্রশান্ত বল্লে।

'গোঁপ না থাক্‌লে তাকে আমার পছন্দ হয় না,' মুখ নিচু করে' হিড়িম্বাদেবী জবাব দিলেন।

'তা আগে খবর পাঠাও নি কেন—একটা সপ্তাহ না হয় গোঁপ কামাতাম না।'

'আমার পছন্দ কাইসারের মত গোঁপ,—এক সপ্তাহে তার কি হ'তো।'

'ভাবিয়ে তুললে,' প্রশান্ত চিন্তিত হয়ে বল্লে। 'ও কি, কাঁদচ কেন?' সত্যি সত্যি স্তম্ভিত হয়ে প্রশান্ত বলে উঠ্‌ল।

'কষ্ট হয়।' কনে বল্লেন।

'কষ্ট কেন?'

'বাঃ রে, এখানটা ছেড়ে চলে যেতে হবে না!'

'কার জন্য কষ্ট হয়! মা বাবা?"

"উহুঁ।'

'তবে?'

'বিশুর জন্য!'

'বিশু আবার কে—তোমার ছোট ভাই?'

'না, আমার বাদামী রঙের ছাগল-ছানা।'

'ছাগলছানা! তা না হয় তাকে নিয়েই যাব। আর নেইত কেউ?'

'আর মালতী।'

'এও কি ছাগল-ছানা, না তোমার সই?'

'মালতী বেরাল-বাচ্চা।'

'আর কে?'

'তুতি আছে টিয়ে; আর কুড়িটা পায়রা, আর টুনু রুনু আমার ঘুঘু; আর টোটো ডুডু এরা বিলিতি ইঁদুর; আর টুলটুল আমার কাঠবেড়ালী; সাহেব আমার খরগোস: সিটি আর ওরা পাঁচটা বুলবুলি; আর হীরা আমার—

'থাক থাক্, আর শুনতে চাইনে,' প্রশান্ত শঙ্কিত হয়ে বলে উঠ্ল, 'একটা চিড়িয়াখানা বিয়ে কর্লে আরও ভাল হতো দেখছি,—কিছুই আর বাদ পড়ত না।'

হিড়িম্বা দেবী আর বাদপ্রতিবাদ কর্লেন না। অত্যন্ত গভীর ভাবে আহত হয়ে তার বদনমণ্ডলের উপর বেনারসী শাড়ির দুর্ভেদ্য রহস্য-যবনিকা টেনে দিলেন। চকিতে বিপরীত দিকে বস্লেন ফিরে।

সেই অবগুণ্ঠন মোচন করতে প্রশান্তের যত সাধ্য সাধনা, যত প্রশস্তি প্রার্থনা করতে হল, তা দিয়ে একটা কাব্য রচনা করা চলে। কিন্তু চাঁদেতে, চামেলীতে, বসন্ত বাতাসে, ফুলের গন্ধে, প্রশান্ততে মিলে যে কবিতা রচনা হল, তাকে প্রকাশ করতে পারে, এমন কবি কেউ জন্ম গ্রহণ করেনি।

—পাঁচ—

বিদায়

অফিস থেকে প্রশান্ত ফাইল নিয়ে এসেছিল বাড়িতে। তাদের নিয়ে ব্যস্ত আছে, এমন সময় চামেলী ঘরের পর্দ্দা সরিয়ে ঢুক্‌ল এসে ভিতরে। চেয়ে দেখে একটু হেসে, ইঙ্গিতে তাকে চেয়ারে বসে ক্ষণকাল অপেক্ষা করবার অনুরোধ করে', প্রশান্ত পুনর্ব্বার কাজে মনো-নিবেশ কর্‌লে।

চামেলী বল্লে—আন্‌তে হবে এক পয়সার নুন, দুপয়সার আদা, তিন পয়সার গরম মশলা, এক আনার পেঁয়াজ—

চোখ না উঠিয়েই প্রশান্ত সকৌতুকে বল্লে—আর পাঁচ পয়সার কি?

'পাঁচ পয়সার ছাতু।'

'আর তার সঙ্গে ?'

'আধপয়সার কাঁচা লঙ্কা।'

'বেশ বেশ', বলে একটু হেসে' প্রশান্ত ফাইল দেখতে লাগল।

'ওগো শুনচ ?' একটু চুপ থাকার পর বল্লে চামেলী।

'হুঁ।'

'জয়েণ্ট্ ইলেক্টোরেট কাকে বলে ?'

'পরে বুঝিয়ে বলব'খন।'

'ছাতাঅলা গলি কোন্ জায়গাটায় ?'

'সহরেরই কোথাও হবে।'

'ঝিলম্ নদীর বাংলা নাম কি ?'

'হিসেব করে' দেখ্‌ব—শতদ্রু, বিপাশা প্রভৃতি পাঁচটার একটা নিশ্চয়ই বটে।'

'রেড্ সীর জল নাকি লাল নয় ?' এইবার প্রশান্তকে ফাইলের থেকে চোখ ওঠাতে হল। এমন জেরার মধ্যে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ মহাভারতের যুগে সম্ভব হ'তে পারত, এ শতাব্দীতে সম্ভবপর নয়।

হেসে বল্লে—আচ্ছা, কি আরম্ভ করেছ বল তো—কাজ করতে দেবে না ?

'অপমান?' কৃত্রিম কোপের সঙ্গে চামেলী দাঁড়িয়ে পড়ল, 'বেশ, এই চল্লুম আমি বাপের বাড়ি—দেখি কেমন করে' তুমি ফিরিয়ে আন!'

গট্ গট্ করে' পা ফেলে মেঝের ওপরে গভীর প্রতিবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রশান্ত একটু হাসলে —ভাবলে, কী জীবন্তই করে রাখে চামেলী সারা বাড়িটাকে। তার চঞ্চল উপস্থিতিতে প্রাণ পায় নির্জ্জীব জড়। হাত দিতে গেছে ফাইলে, এমন সময় চামেলী ছুটে এল বিজয়িনীর মত। হাতে তার এক ছেঁড়া খাম। সেটা হাওয়াতে সগর্ব্বে নাড়তে নাড়তে বল্লে—বিশ্বেস হচ্ছিল না, বাপের বাড়ি যাওয়ার কথাটা,—তাই না? ভেবেছিলে, ও আমার মিছিমিছি ভয় দেখানো? এই দেখো চিঠি।

এঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই চামেলী পেল এক চিঠি চাকরের হাতে। ওর বাবা লিখেচে প্রশান্তের কাছে। চামেলীর বড়দার ছেলের অন্নপ্রাশন—দুজনকেই যেতে হবে।

প্রশান্ত হাত বাড়িয়ে বল্লে—দেখি?

সগর্ব্বে চিঠিটা তার হাতে সমর্পণ করলে চামেলী।

প্রশান্ত বল্লে—'আমি গেলুম কেন? তুমি যাবে

গোসা করতে, আর আমি দেব গোসা-আগারে পৌঁছিয়ে ?'

'বেশ মানুষ তো !' চামেলী বল্লে। 'তবে আমি কাকে নিয়ে গোসা করতে যাব ?'

পৌঁছিয়ে দিতে প্রশান্তের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। স্ত্রীর গোসা-আগারটা তার কাছেও কম লোভনীয় নয়। কিন্তু দেখা গেল, সেই উৎসবের সময়টাতেই পড়েছে তার অফিসের ইন্‌স্পেকশানের কাল। যাওয়ার সম্ভাবনাটা লোপ পেল। চিঠি লেখা হল এই মর্ম্মে চামেলীর বাপের বাড়িতে। তারা জবাব দিলেন—চামেলীকে আনবার জন্যে ওর ছোটকাকাকে পাঠান হচ্চে।

শেষ-রাত্তিরে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গিয়েচে। গ্যাসের আলো রাস্তা থেকে এসে বিছানাতে একটু, খাটেতে বা একটু ছোঁয়া দিয়েচে। এমন অলস মনে হয় রাত্রিটাকে যে তাকে জাগাতে হয় মায়া।

'মিলি ?'

'কি ?'

'নাই বা গেলে অন্নপ্রাশনে—একা পড়ে থাক্‌তে আমার ইচ্ছেই হচ্চে না।'

'কিন্তু কাকাবাবু এসেচেন যে', দ্বিধাভরে চামেলী বল্লে।

'কাকাবাবুকে না হয় বল আর দুদিন থাক্‌তে—অসম্ভব রকম রোজ ভোজ খাওয়াতে আরম্ভ কর। পেটের অসুখ কর্‌লে, আপনিই পালাবেন- তোমার জন্য আর দেরি করবেন না।' প্রশান্ত বল্লে।

'কি চমৎকার মাষ্টারই আমি পেয়েছি,' একটু চাপা হাসি হেসে জবাব দিলে চামেলী, 'অতিথি-সৎকারের পূর্ণজ্ঞান লাভ হল। ··· কিন্তু ওতে সত্যি সুবিধে হবে না,—পাঁচজনের খাওয়া একা খেলেও কাকাবাবুর পেট খারাপ করবেনা—অসম্ভব ওঁর হজমশক্তি ; লাভের মধ্যে তোমারই মাসশেষ হওয়ার আগে টাকা যাবে ফুরিয়ে।'

'মুস্কিল করলে তো,' প্রশান্ত চিন্তিতস্বরে বল্লে, 'তবে আমিই কলিক্‌-পেন্‌ করে' বসব ?'

'কাকাবাবু আবার সখের হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন। তার অব্যর্থ ওষুধে কলিক্‌-পেন যদি না ছাড়ে, নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করবেন, বেদনাটা মিথ্যে'—বল্লে চামেলী।

কাকাবাবুর বিদায়গ্রহণ সম্বন্ধে প্রশান্ত হতাশ হল।

'মিলি ?'

'হুঁ।'

'কদিন থাক্‌বে বাপের বাড়ী ?'

'আজকে তো তেইশে ফাগুন। চৈত মাসটা আর আসতে দেবে না—আসতে সেই বৈশাখ। নববর্ষে বিজয়ী বীরের মত তুমি অভিযান করো'—বন্দী করে' নিয়ে এসো আমাকে। কার সাধ্যি আমাকে রাখে ধরে।'

'মিলি।'

'কি ?'

'তোমার হার্টটা দুর্ব্বল—এই জন্যেই আমার ভয়।' প্রশান্ত প্রকাশ করে ফেল্লে তার আশঙ্কাটা।

শুনে চামেলী খিলখিল করে' হেসে উঠ্‌ল। বল্লে—অদ্ভূত মানুষ! সেই সেবার জ্বরের সময় ডাক্তার বলেছিল—তাই মনে করে' রেখেচ! হার্ট আমার চিরদিনই দুর্ব্বল—ছোট বেলা থেকেই। কিন্তু কৈ মরলুম না তো একদিনও। যদি একদিন মরেই যাই—

'ভাল হবে না বলচি, মিলি।' প্রশান্ত ধমকে বল্লে।

'বাঃ রে, মরে যেতে পারি নাই—সবাই মরে যেতে পারে।' মিলি বল্লে।

'পারেই তো—আমিও পারি।'

'ভাল হবে না বলচি। তোমার যা মুখে আসে তাই বলবে?' বলে' গভীর প্রতিবাদের সঙ্গে চামেলী উল্টো দিকে ফিরে শুল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তার বুক থেকে বেরিয়ে এসে প্রশান্তকে অপ্রতিভ করে' দিলে।

'মিলি?'

'বলব না আমি কথা।'

'লক্ষীটি, সাবধান হয়ে থেকো।'

'থাকব না।'

'দৌড়বে না কক্ষণো; পরিশ্রম করবেনা বেশি।'

'করবো।'

'তা হলে এই আমি যেতে দিলুম না', বলে চামেলীর একটা হাত টেনে নিয়ে প্রশান্ত বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। 'মিলি, আমাদের স্বর্গের প্রথম সর্গ সমাপ্ত হল; দ্বিতীয় সর্গ স্থুরু হবে কবে?'

সারাটা ভোরবেলা প্রশান্ত চামেলীর পিছন পিছন ঘুরে বেড়াল। বাইরে বসে আছে এক অতিথি সে কথা অর্দ্ধেক ভুলেই গেল সে। চামেলী ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিচ্চে ঘরকন্না: চাকরকে করচে সাবধান। সে চলে' যাওয়ার পর প্রশান্তের যাতে একটুও অসুবিধে না হয়, দুজনকেই শাসিয়ে বুঝিয়ে দিচ্চে।

'মিলি, ওরা আমায় নাবালক ভেবে বসচে না তো ?' প্রশান্ত সহাস্যে বল্লে।

'তুমি তার বেশি কিনা', গম্ভীর হয়ে বল্লে চামেলী।

'মিলি, যাব না আজ অপিসে—অসুখ হয়েচে লিখে দিই।'

'আচ্ছা, আমি যাব রাত্রি নটায় ঃ আর তুমি কামাই করবে অপিস !—দেখ তো কাণ্ড ! আমি কি অগস্ত্যযাত্রা করচি—চিরদিনের জন্য যাচ্ছি চলে ?' চামেলী মৃদু হেসে বল্লে।

প্রশান্তের আসন্নবিরহবেদনাতুর মুখটা উঠ্‌ল অধিকতর অপ্রসন্ন হয়ে। বল্লে—কি যাতা যে বল, মিলি —ভাল লাগে না।'

'আচ্ছা, লোকে শুনলে কি বল্‌বে ? ঠাট্টা করবে না তোমাকে ?'

'করুক গে।'

'চল লক্ষ্মীটি বসবার ঘরে। এস্রাজে একটা চমৎকার ভৈরবী শুনিয়ে দেব।'

'চাইনে শুনতে ভৈরবী।'

'তা'লে চল, গুছিয়ে দেবে আমার বাক্সটা।'

'দেব না।'

স্বর্গ

অপিস থেকে দুঘণ্টা আগে ছুটী নিয়ে চলে এল প্রশান্ত।

কৌতুকের বন্যা ছুটিয়েছে চামেলী। হঠাৎ গেয়ে উঠচে একটা গানের কলি সহাস্যমুখে, ভঙ্গী করে' গুছোচ্চে একটা কাপড়: চকিতে এসে হয়তো বেষ্টন করচে প্রশান্তের গ্রীবা. দুষ্টুমির তার অন্ত নেই।

'ওগো।'

'কি', গম্ভীরস্বরে বল্লে প্রশান্ত।

'বিখ্যাত হ'তে তোমার আর দেরি নেই।'

'সে কি?' বিস্মিত হয়ে বল্লে প্রশান্ত।

'তুমি যে শীগগির্ই বিরহের এক মহাকাব্য লিখে ফেলচ—মুখখানা দেখে তাতে আর আমার সন্দেহ নেই। আয়নার সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াও না', বলে হেসে চামেলী লুটোপুটি খেতে লাগল।

প্রশান্তের সন্দেহ ক্রমে গভীরতর হল যে মেয়েদের ভালবাসা সত্যই বড় অগভীর। আসন্ন বিচ্ছেদের যে বেদনায় ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েচে সে, তার একটুও হাওয়া লাগল না চামেলীর মনে। পিতৃগৃহে যাবার অপার আনন্দে খুসিতে সে টগ্‌বগ্ করচে: কৌতুকে হাসিতে বহালে প্লাবন। চুপে চুপে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে ফেললে প্রশান্ত।

স্বর্গ

গাড়ি ছাড়তে আর দেরি নেই। চামেলী ট্রেণের কামরায় হেলান দিয়ে আছে বসে। বিরস মুখে বাইরে জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে আছে প্রশান্ত। শ্রাবণের আকাশের মত থমথমে মুখটা নিচু করেই আছে—চামেলীর দিকে চাইতে সাহসই হচ্চে না। মনের মধ্যে কেবলই আশঙ্কা জাগতে লাগল—এই যদি শেষ হয়—এই যদি শেষ হয়!

চামেলী বল্লে, 'ওগো!'

'কি!' মুখ নিচু করেই বল্লে প্রশান্ত।

'কেঁদে ফেলবে না কি?' মৃদু ব্যঙ্গ করে' মৃদুতরস্বরে বল্লে চামেলী।

প্রশান্ত জবাব দিলে না।

'রাম রাম, লোকে বলবে আমার ছিঁচকাদুনে বর।'

চুপ করে রইল প্রশান্ত। লাগল আঘাত মনে। এই বিচ্ছেদের ক্ষণে চামেলী করচে কৌতুক, হাসচে অপরিমিত, একটু জানালে না বেদনা, ভাবতে মনটা অধিকতর বেদনাতে মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল।

পড়ল যাত্রার ঘণ্টা। ইঞ্জিন দিলে সিটী। নড়ে উঠ্‌ল গাড়িটা। সুরু করল চলতে। তাড়াতাড়ি মুখ ওঠালে প্রশান্ত চামেলীর মুখটা দেখে নেবে বলে।

চমকে উঠ্‌ল।

দেখলে চামেলীর দুই গাল গড়িয়ে অজস্রধারায় অশ্রু ঝরে পড়চে। প্ল্যাটফর্ম্মের আলোকের স্পর্শ পেয়ে এক নিমেষে সেই অশ্রু হীরার মত চক্‌চক্‌ করে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি .মুখটা টেনে নিয়ে গেল চামেলী গাড়ির ভেতর।

তর্জ্জনীটা কামড়িয়ে প্রশান্ত স্খলিতকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, —তোমার বেদনাটা হাসি দিয়ে এমন কি করে লুকিয়ে রেখেছিলে, মিলি! অদ্ভূত তোমার শক্তি!

স্বর্গ

—ছয়—

শ্রাবণ-স্বপ্ন

সকালবেলা হতেই বৃষ্টি স্বরু হয়েছে—তার আর থামবার কোনও লক্ষণই নেই। যদিই বা একটু থামে, আকাশে লেগে থাকে সজলতা ; সন্দেহ থাকেনা, পরের মুহূর্ত্তে আবার প্লাবন স্বরু হবে। আকাশ যেন মস্ত শোক পেয়েছে, বুকের মধ্যে বেদনার কুণ্ডলী গুমরে গুমরে উঠ্‌ছে,—কান্না চাপ্‌তে যায়, পারেনা ; অশ্রু শতমুখী হয়ে উপ্‌চে পড়ে।

আকাশ যখন রৌদ্রের স্পষ্টতায় প্রদীপ্ত থাকে, তখন ভাবা যায় না, এমন রহস্যমণ্ডিত হয়ে উঠবার ক্ষমতা সুনীল আকাশের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল। বাদলের আকাশকে, বাদলের দিনকে বুঝা যায়না,—সে জগৎ-রহস্যের মতই বুদ্ধির অগোচর, তাকে বুঝতে হলে অন্য পথে যেতে হবে। কদম্ববন তাকে বুঝতে পেরেছে কিনা কে জানে—অজ্ঞাতপুলকে তার পাতা যায়

ফুলকলিতে ছেয়ে, ডালে ডালে মর্ম্মর জেগে ওঠে, অন্ধকার আকাশের সঙ্গে কি বাণীবিনিময় করে, কে তার অর্থোদ্ধার করবে !

ছুটীর দিন,—প্রশান্ত অফিসে যায়নি। আধভেজা বারান্দাটায় ইজিচেয়ারে বসে বাইরে চেয়ে চেয়ে, চোখ বুজে বুজে, আধজাগা সাধ-স্বপ্নে এই স্বপ্নময় দুপুরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে দিয়েচে।

আজ তিনটে মাস ধরে সে সহানুভূতি চেয়ে এসেছে পৃথিবীর কাছে, আকাশের কাছে। খররৌদ্রের মধ্যে রুদ্রের ভ্রূকুটি তার শোক-সন্তপ্ত চিত্তকে শাসন করেচে, তর্জ্জন করেচে। যেন এক প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্ম্মম দেবতা তার সর্ব্বস্ব হরণ করেও তৃপ্ত হয় নি, জিঘাংসার তরবারি এখন উদ্যত করে' সারাক্ষণ শাসিয়ে বেড়াচ্চে, তার বিভৎস শো িত-তৃষা এখনও মেটেনি। আজ নববর্ষা শ্যামদুর্ব্বাদলরূপে এসেচে আকাশ ভরে', দুচোখে তার করুণার স্নিগ্ধাঞ্জন, সমস্ত আকাশে সহানুভূতির ছায়া লেগে গেল।

যে প্রশান্ত বিধাতার অবিচারে বিক্ষুব্ধ, উপায়হীন প্রতিবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ তারও দুচোখ উঠ্‌ল জলে ভরে'।

স্বর্গ

চামেলীকে হারিয়েছে সে আজ তিনমাস। কিন্তু এখনও যেন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারচেনা—সমস্তটা এখনও অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলে মনে হয়। বুদ্ধির মধ্যে কোথাও একটা দ্বন্দ্ব চলচে,—তার একদিক বলচে,—হারিয়ে গেচে, শেষ হয়ে গেচে তোমার প্রিয়া—হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল; অন্যদিক বলচে—অসম্ভব, সে কি হারাতে পারে? দুষ্টুমি করে' কোথাও লুকিয়ে আছে তোমার বুদ্ধির আড়ালে, তোমার দৃষ্টি-শক্তির বাইরে! একদিন গীতমুখর উৎসবমুখরিত রাতে ধুমাগ্নিশিখার সমুখে অবগুণ্ঠিতা সরমভীরু যে তরুণীকে দেবতার আশীর্ব্বাদের মত পেয়েছিলে, তাকে হারাবে কার অভিশাপে? জন্মজন্মান্তরে তাকে হারান যায় না।

আজ বর্ষণমুখর দ্বিপ্রহরে মেঘমন্দ্রে, তরল মুক্তাধারায় যখন প্রকৃতি আচ্ছন্ন যখন কেতকীর গন্ধে সজলবাতাস সুগন্ধি হয়ে উঠচে, তখন প্রশান্তর বুক মথিত করে' এই কথাটাই ঠেলে উঠ্‌ল—কই সে? নেই তো—কাছে তো নেই!

চোখ দুইটা স্তিমিত করে' মসীকৃষ্ণ মেঘের দিকে চেয়ে সে ভাবতে লাগল,—মরলে কি মানুষের সত্ত্বার সম্পূর্ণ অবসান ঘটে? অশরীরী অস্তিত্ব সত্যি কি আছে?

না, মানুষের সান্ত্বনা পাওয়ার সেটা একটা অভিনব পন্থা—আত্মপ্রবঞ্চনার একটা নামান্তর? দর্শনের তো জগতে অন্ত নেই,—কিন্তু প্রমাণ কিছুই হয়নি। সাম্ভাব্যতার হিসেব করে' আদর্শবাদী ও বাস্তববাদীতে শুধুমাত্র ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

তার চামেলীর আর কোনও অস্তিত্ব নেই, সেই চকিত-নয়না, কলহাস্যপরায়ণা বনহরিণীর মত চঞ্চলা মেয়েটী বিশ্বসৃষ্টির আদিম কাঁচা মালে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেচে, ভাবতে সত্যি শিউরে উঠ্‌তে হয়; অনেক অসম্ভব সম্ভাবনার আশা দিয়ে চৌচির-হয়ে-ফাটা মনে যে জোড়াতাড়া লাগিয়েচে, এক মুহূর্ত্তে সেগুলি পট্‌পট্‌ করে ওঠে।

পরজন্ম যদি থাকে, সূক্ষ্মশরীর যদি গাঁজাখুরি ব্যাপার না হয়, তবে বাস্তবিকই বাঁচা যায়। শোক তবু সহ্য করা সম্ভব হয়। কিন্তু তার নিশ্চয়তা কই? বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত ব্যাপারটাকেই অবিশ্বাস করে' বসেচেন, তাদের যুক্তি কম প্রবল নয়, তাদের সন্দেহবাদ যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—কে বলতে পারে তাদের কথা ঠিক নয়। অপ্রিয় বলেই যে তা অসত্য হবে, তা বলা চলে না। দর্শনগুলি বিশ্বের রহস্য ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা মাত্র—তারা যে সত্য, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

অশ্রান্ত বর্ষণ সত্ত্বেও প্রশান্তের মাথাটা আগুনের মত গরম হ'য়ে উঠল। একটা স্বপ্নের মত চামেলী এল, স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল,—অনন্তকালের মধ্যেও আর তাদের মিলন হবে না।

এক সময় যে ইলেকট্রনগুলিতে চামেলীর সুন্দর দেহ গঠিত হয়েছিল, হয়তো তার সামান্য কয় কোটি ইলেকট্রন্ ইথরের সমুদ্র থেকে আহৃত হয়ে' অন্যান্য কোটি কোটি ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অনাগত নতুন দেহীর সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হবে। চামেলীর বাকি ইলেকট্রনগুলি দিয়ে সৃষ্টি হবে হয়তো একটা লতা, একটু জ্যোৎস্না, একটা চাঁপা ফুল, একটা চড়ুই পাখী। কোথায় থাক্‌বে তার চামেলী!

প্রশান্ত মনে মনে প্রার্থনা করে, এ যেন সত্য না হয়, সত্যি যেন চৈতন্যময় এক ভগবান বিশ্বসৃষ্টির কর্ণধাররূপে থাকেন। জীবাত্মা যেন সত্যি থাকে। জীবনের সমস্ত আশা, সমস্ত স্বপ্ন যেন ভগবান সার্থক করে' তোলেন, আপাতবেদনা যেন একটা চরম আনন্দে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এ তো স্বপ্ন, এ তো বিশ্বাস, এর প্রমাণ কোথায়? মানুষের মন শান্তি পায় না, তার যুক্তি তাকে সন্দেহপর করে' তোলে।

'দূর ছাই', বলে প্রশান্ত ইজিচেয়ার থেকে উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। এসব ভাব্‌বে না—দার্শনিক মতবাদগুলি যেন মরুভূমির মধ্যে কতকগুলি মরীচিকা,—তাদের পিছনে পিছনে ছুটে যতই হয়রাণ হয়ে পড়, প্রার্থিতের সন্ধান আর মিলবে না।

বৃষ্টি জগৎকে কবিতা পড়ে শোনায়। কী তার ছন্দ, কী তার অনুপ্রাস, কী তার আবেগ, কী কল্পনার দ্বার খুলে দেয় সে! প্রশান্ত আবার এসে ইজিচেয়ারে বসে পড়ল।

আজ দার্শনিকদের মতামতগুলিকে সে বর্জ্জন করবে ঠিক করলে। মনে মনে বললে, পড়ুক অশ্রান্ত বৃষ্টি, যূঁইফুলের গন্ধ আসুক, মেঘের মন্দ্র ঘনিয়ে তুলুক রহস্যের ছায়া, আমি শুয়ে শুয়ে এখন মনে করবো, চামেলী মরেনি, সে আমার মতই বেঁচে আছে—বাদ্‌লার দুপুরটা ভরে তার সঙ্গে অনর্গল গল্প করে' কাটাব।

বিশপ্‌ বার্ক্‌লে বুঝি বলেছিলেন—জগতে বস্তু কিছু নেই, আমাদের আইডিয়া মাত্র আছে,—বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাই বস্তুকে বস্তুত্ব দেয়। প্রশান্ত আজ সর্ব্বপ্রথম তার যুক্তিবাদ অনুসরণ করে নিজেকে বোঝালে—আমি যদি আজ চামেলীকে আমার পাশে

কল্পনা করে নিতে পারি, তবে সে নেই কেমন করে' বলতে পারো ? এই তো আমি তার চুলের গন্ধ পাচ্চি, শুনতে পাচ্চি চুড়িতে বালাতে যে সেতার বাজ্‌চে, একটা সুগন্ধি সান্নিধ্য সমস্ত মন দিয়ে অনুভব করচি।

প্রশান্ত এলিয়ে আছে ইজিচেয়ারে,—তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে বাদল-আকাশের পানে। কিন্তু স্পষ্ট টের পেল, চামেলী এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে। ফিরে তাকালে না, শুধু মৃদুস্বরে বললে—একটা ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্চি।

'কোথায় ? আমি পাচ্চি না তো', চামেলী বল্‌লে।

'আমি পাচ্চি।'

'কি ফুল, বল না !'

'চামেলী।'

'যাও', বলে চামেলী এসে ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসে পড়লো। প্রশান্ত তাকালে না, চোখ বুজে বুজে তার সান্নিধ্য উপভোগ করতে লাগল।

'মিলি !'

'কি ?'

'তোমার আঙুলগুলি দিয়ে আমার মাথার চুলগুলি একটু আঁচড়ে দাও।'

'না, দেব না।'

'কেন? লক্ষ্মীটি!'

'এক্ষুণি তা হ'লে নাক ডাকাতে সুরু করবে তো?' ব'লে চামেলী তার চাঁপার মত আঙুল দিয়ে প্রশান্তের মাথা আঁচড়ে দিতে লাগল।

'মিলি!'

'কেন?'

'বর্ষার দিনে কেন দুঃখ ঠেলে আসে মনের মধ্যে? দুঃখ আমার কোথায়? তুমি আছ আমার পাশে, আমার মনের মধ্যটা ভরে রেখেচ মিলনের আনন্দে, তবে আমার দুঃখ কিসের? কিন্তু তবু, কেন এই 'অন্যথাবৃত্তিচেতঃ'?'

'কি জানি'। চামেলী বললে।

'বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে বিরহের একটা মহাসাগর আছে, হয়তো এ তারই অশ্রুজলকল্লোল—বাদলের দিনে তার হাওয়া আসে, জলবুদ্বুদ এসে মানুষের মনে পৌঁছায়।'

উত্তরে চামেলী কিছু বল্লে না, শুধু বাঁ হাতটা প্রশান্তের গলায় মালা করে পরিয়ে দিলে।

'চামেলী?'

'কি?'

'কিছু না! চামেলী বলে আমার ডাকতে ভাল লাগে, তাই।'

'বৃষ্টির ছাট্ আস্চে যে,—শেষে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।'

'লাগুক,—তুমি উঠো না আমার পাশ থেকে।'

ঢং ঢং করে' ঘড়িতে চারটে বাজ্‌ল। চামেলী ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে,—ঐ দ্যাখো, চারটে বেজে গেল। মেঘ আর বৃষ্টি দেখলেই পেট ভরবে না তো,—বল, কি খাবার আনব?

প্রশান্ত চোখ বুজেই বল্‌লে, 'চা মিলি'।

'শুধু চা?'

'শুধু চা-মিলি।'

'কেবল দুষ্টুমি', বলে ইজিচেয়ারের হাতলের থেকে চামেলী উঠে দাঁড়ালে।

'লক্ষীটি, বস বস, যেও না', বলে প্রশান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে চোখ মেলে চাইলে। দেখ্‌লে, বৃষ্টি পড়চে, মেঘ ছুটে চলেছে আকাশে, কেউ নেই তার পাশে, চামেলী স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে।

অশ্রুজলে দুচোখ কখন ভরে' গিয়েছে, টের পায়নি। হাত দিয়ে যতই মুছ্‌তে যায়, শ্রাবণের আকাশের মত আরও অশ্রু বেরিয়ে আসে।

প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। পায়চারি করতে করতে বলতে লাগল—কেন আমি দুঃখ করচি, কে বলেছে আমার

চামেলী শেষ হয়ে গিয়েছে। এই তো তার সান্নিধ্য আমি আমার মন দিয়ে উপভোগ করলাম, কল্পনা দিয়ে তাকে পেলাম কাছে,—কতগুলি মুহূর্ত্ত মিলনানন্দে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। আমার দৃষ্টিশক্তির, আমার স্পর্শশক্তির চাইতে আমার কল্পনাশক্তি কি কম সত্য? যাকে চোখ দিয়ে দেখে সত্য বলে স্বীকার করতে পারি, তাকে মন দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি যদি, যদি কল্পনা দিয়ে কাছে আনতে পারি, সে কম সত্য হবে কেন?

চামেলী শেষ হয় নি। যতদিন আমার মন থাক্‌বে, অন্তত ততদিন সে অমর হয়ে থাক্‌বে।

অনেকটা শান্ত হয়ে প্রশান্ত আবার ইজিচেয়ারে এসে বসল।

নিচে থেকে কেতকীর গন্ধ আসচে, সোনালী কদমফুল বাদল-হাওয়াতে নাচ্‌ছে গাছের মাথার উপর, আকাশে কোন্ দেবতা ক্রমাগত তুলি বুলিয়ে নতুন নতুন ছবির সৃষ্টি করে চলেছে।

সহসা প্রশান্তের মনের মধ্যটায় মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল। সত্যি বটে, চামেলী তার কাছে মরে নি;—মন দিয়ে, কল্পনা দিয়ে প্রশান্ত তাকে ডেকে আনতে পারে একান্ত নিকটে, তার উষ্ণ সান্নিধ্য, তার দেহের সৌরভ পর্য্যন্ত

উপভোগ করতে পারে। কিন্তু চামেলী কি পারে তার চেয়ারের হাতলে এসে বসতে? এই যে কেতকীর গন্ধে বাতাস ভরে গেছে, এই যে বাদল পৃথিবীর নতুন রূপ সৃষ্টি করে তুলল, এই যে নীপবনে সোনার কদম্ব নৃত্য সুরু করেচে, চামেলী হয়তো পারেনা এদের দেখ্‌তে, পৃথিবীর এই রসের আনন্দ থেকে হয়তো সে চিরদিনের মত বঞ্চিত হয়ে গেছে। তাই যদি সত্যি হয়, তবে? প্রশান্ত নিজের দুঃখ দূর করবার উপায় খুঁজে পেয়েচে, কিন্তু রূপরসগন্ধস্পর্শ চামেলীকে আর কি কখনও পুলকিত করবে না? এই অপূর্ব্ব সুধা হতে সে কি চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়ে গেল?

প্রশান্ত আর সান্ত্বনা পেল না। দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। কল্পনা দিয়ে, কবিত্ব দিয়ে আর মন প্রবোধ পাচ্চেনা,—আবার দর্শনের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে।

—সাত—

স্বপ্ন

অফিস থেকে ফিরতে প্রশান্তের সন্ধ্যা হয়ে গেল।

রাস্তা থেকেই অন্ধকার ঘরের দিকে বিষণ্ণ মনে চেয়ে দেখল। গৃহে যে সন্ধ্যাদীপ জ্বালায়, পথ পানে যে চেয়ে থাকে উৎসুক হয়ে, জীবন থেকে সে চলে গেছে অন্তহীন রহস্যের মধ্যে। মৃত্যুরহস্যের মধ্যে একটু আলোকও কেউ ফোঁটাতে পারলে না।

চামেলী যদি থাকত বেঁচে, অন্ধকার থাকত না আর ঘরে, উৎসুক মনে বারম্বার এস্রাজটা থামিয়ে জান্‌লা দিয়ে উঁকি দিত। সুরভিতে, চঞ্চল উপস্থিতি ও সুউষ্ণ আগ্রহে, সুরে, কটাক্ষে লীলায়িত দেহের ছন্দিত লাস্যে এই অর্থ-হীন আনন্দহীন গাম্ভীর্য্যের তপোভঙ্গ হ'ত।

আজ নেই সে; তাই নেই আনন্দ, নেই সজীব পুলক-চঞ্চলতা, নেই স্বপ্ন, গন্ধ, সুর। বাড়িতে ঢুকতে আর ইচ্ছেই হচ্চে না। মৃত্যুর মতই ওর আবহাওয়া—

বাণীহীন, সুরহীন, চাঞ্চল্যহীন : প্রাণস্পন্দন আসতে চায় থেমে, কল্লোলহীন নিস্তরঙ্গ জলের মত তা অস্বাভাবিক,— এমন কি জলের তরল স্বচ্ছতা পর্য্যন্ত নেই।

ক্লান্ত দেহটা কোন রকমে টেনে প্রশান্ত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। চামেলী যদি জীবিত থাকত তবে কি বলত তা অন্ধকার সিঁড়ির মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত ভাবতে চেষ্টা করলে।

'এত রাত্রি কেন ?' চামেলী চটে উঠে বল্লে।

'কাজ।'

'কাজ ? রাত্রি অবধি ?

'হুঁ, রাত্রি অবধি।'

'মাইনে বাড়াতে চাও বুঝি ? বিকেলে কিছু খাওনি তো ? তা আমি আগেই বুঝতে পেরেচি,—কি করবো তোমাকে নিয়ে বল তো ?'

'মাথাটা একটু টিপে দেবে এস।'

'দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত অবধি মিছিমিছি কাজ করে এসে বলবেন,—মাথা ধরেচে, টিপে দাও। কেন ? আমি টিপতে গেলুম কেন ? সারা বিকেলটা উপোস করে থাকলে লোকের মাথা ধরবে না ? মাথার দোষটা কি শুনি ?'

'বাঃ রে, কে বল্লে তোমাকে বিকেলে খাইনি' ?

'আমার যেন বুঝতে কিছু বাকি আছে,—বিকেলে যদি খাবেই, তবে এমন দেখাবে কেন ? লক্ষ্মীটি, যাও হাত পা ধুয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে হাওয়ায় একটু বস গিয়ে, আমি লুচি ভেজে নিয়ে আস্‌চি।'

'না মিলি, তুমি চল আমার সঙ্গে, চাইনে লুচি।'

'দেখ, কি আদিখ্যেতা! ও ঠাকুর, শুনচো, ক'খানা লুচি বেলে তাড়াতাড়ি ভেজে ফেল তো—শীগ্‌গির করে। দেরি হয় না যেন—বাবু এসেচেন।—না, আমি পারব না রোজ রোজ গলার গিঠ খুলে দিতে,—কি করে নেকটাই বেঁধে সারাক্ষণ থাক তোমরা ?'

'দাও লক্ষ্মীটি'

'ঈস্‌, দেখতো তোমার থুতনিটাতে হাতটা কি রকম লেগে গেল।—বাস্‌রে; দাড়ি না কাঁটাবন। ছাড়, ছাড়, যাঃ—আমি অডিকোলন নিয়ে আসচি, তুমি কাপড় বদ্‌লে নাও।'

দক্ষিণের বারান্দাটা জ্যোৎস্নায় ভরে' গিয়েচে,—হাওয়া আসচে চমৎকার। ইজিচেয়ারে চোখ বুজে পড়ে আছে প্রশান্ত, চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে চামেলী আস্তে আস্তে তার কপালটা দিচ্চে টিপে। চুলের গন্ধ.

অঙ্গরাগের গন্ধ, চুড়ি বালার শব্দ, সুরভি নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ, একটা ভাষাতীত মদির আসঙ্গ, একটু পাণ্ডুর জ্যোৎস্না, দেহের উপর ছায়ার একটু চঞ্চল আল্পনা—স্বর্গ আর খুঁজে বেড়াতে হয় না। প্রশান্ত ভাবে সে অমরার কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছে; এই অনুভূতির চিরস্থায়িতাকেই বলে স্বর্গ!

চমকে উঠে অন্ধকার সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত সহসা নিজেকে আবিষ্কার করলে। স্বর্গ হতে সে নির্ব্বাসিত হয়ে চলে এসেচে। মিলিয়ে গেছে হাসি, হারিয়ে গেছে সুর, মন্দারমালার সুগন্ধ ভোজবাজীর মত অন্তর্হিত হয়েচে।

ক্লান্ততর পদে সে উপরে উঠে এল। চাকরকে হাঁক দিলে। জিজ্ঞেস করলে রান্না হয়েছে কিনা। দেরি আছে শুনে বারান্দার ইজিচেয়ারে গিয়ে এলিয়ে পড়লে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পোষাক খুলবার পর্য্যন্ত উৎসাহ পেলে না।

কৃষ্ণচূড়ার চিত্রিত পল্লবের ফাঁকে এক টুকরা চাঁদ উঠেচে। তরল অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাটাকে ভারি করুণ মনে হয়,—যেন তার হাসির মধ্যে অনেকখানি অশ্রু জল মেশান আছে। যে দার্শনিক দৃষ্টি পৃথিবীকে একটা

ভাবমূর্ত্তির জড়প্রকাশ বলে সিদ্ধান্ত করেছে, তাকে যেন অনেকটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। অতি সূক্ষ্ম একটা বস্তু আছে সৃষ্টির কেন্দ্রে,—রহস্যময় এক মহাচৈতন্যের ভাববিলাসে তা নানা বস্তুরূপ নিয়ে প্রকট হয়ে ওঠে।

সেই মহাচৈতন্যের বুদ্বুদ মানুষ। তার ভাব দিয়ে সেও পারে বস্তুরূপ সৃষ্টি করতে,—সৃজনীশক্তির আংশিক বিকাশ মানুষের মধ্যেও দেখতে পাই। সৃষ্টি বুদ্বুদ, তার অস্তিত্বটা ক্ষণস্থায়ী। যে কল্পনা জড়কে সৃষ্টি করে, একদিন তার নবসৃষ্টির আকাঙ্খা জেগে ওঠে, বুদ্বুদের মত পুরাতন সৃষ্টি মিলিয়ে যায় কালসিন্ধুর মহবারিরাশির মধ্যে।

প্রশান্ত ভাবতে লাগল, সে-ই কি তার কল্পনা দিয়ে, ইচ্ছাশক্তি দিয়ে, আকাঙ্খা দিয়ে চামেলীকে সৃষ্টি করেছিল? কালিদাসের কাব্য পড়তে পড়তে তরুণ যৌবনে যে দুটী আঁখির সে স্বপ্ন দেখেছিল, রামধনুর মত যে দুটী বঙ্কিম ভুরুর কল্পনা করেছিল, প্রবালের মত যে অধরোষ্ঠ, পদ্মমৃণালের মত যে বাহু, সঞ্চরিণী পল্লবিনী যে লতার মত দেহ সে কামনা করেছিল, সম্পূর্ণ অজানা হ'তে আহৃত চামেলীর মধ্যে তাদের পরিপূর্ণ রূপ নইলে সে পেল কি করে? তার ভাব চামেলীরূপ পরিগ্রহ করেছিল কিসের মন্ত্রে? কোন্ দার্শনিক সূত্রে তা এমন সম্ভবপর হয়েছিল?

স্বর্গ

আজ তরল জ্যোৎস্না উঠে জগত স্বপ্নময় করে' তুলেছে, ঝিল্লীমন্ত্রে জড়ত্ব লোপ পাবার উপক্রম হয়েচে, নিচের কেতকীর ঝাড় থেকে ঘন সুগন্ধ এসে অতীন্দ্রিয় আব-হাওয়ার সৃষ্টি করেছে। আজ যদি প্রশান্ত তার সমস্ত মনঃশক্তি, তার সমস্ত কল্পনা ও কামনা দিয়ে চামেলীকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে তবে কি চামেলী আবার সেই বরাঙ্গ পরিগ্রহ করতে পারে না। সেই তনুদেহে তেমনি লীলায়িত লাস্য, সেই পদ্ম আঁখিতে তেমনি নিবিড় প্রেম, সেই প্রবাল-অধরে তেমনি জ্যোৎস্নানিন্দিত হাস্য, এমন কি হ'তে পারে না আর ? কেন পারবে না ? অজানাকে একদিন সে সৃষ্টি করেছে কল্পনা দিয়ে, জানাকেই কি নতুন করে সৃষ্টি করবার ক্ষমতা তার নেই ?

মনে মনে প্রশান্ত গভীর বিশ্বাস ও প্রবল আগ্রহের সঙ্গে বল্লে—আজ তোমাকে আমি আবার সৃষ্টি করব, চামেলী, করবোই ? শুধু ভাব নয়, তুমি বস্তু হয়ে, তোমাব তনুদেহ নিয়ে আজ উপস্থিত হবে আমার কাছে। আমি কি কম ?—আমি যে ঈশ্বরের শক্তির অংশ ধারণ করি আমার মধ্যে। সৃষ্টি করতে পারবো না আমি কেন ?

চাকর এসে বল্লে, রান্না তৈরি। প্রশান্তের কল্পনায় বাঁধা পড়ল। ইচ্ছে হল ভয়ানক ধমকিয়ে দেয় তপো-ভঙ্গকারীকে—চেঁচিয়ে বলে সে খাবে না। কিন্তু খাবেনা বলতে তার সাহস হল না। সে খায়নি শুনলে চামেলীর চোখদুটা কেমন তিরস্কারের ভঙ্গীতে তার দিকে তাকাবে ভেবে সে শিউরে উঠল,—খাব না বলতে আর সাহস হল না। বল্লে, নিয়ে আয় খাওয়ার এইখেনে।

নিঃসঙ্গ চুপে চুপে প্রশান্ত খাওয়া শেষ করলে। যে খাওয়াটা চামেলির সান্নিধ্যে ছিল আনন্দ, আজ তা শুধু মাত্র শরীর ধারণের উপায়। চোখ দুইটা তার জলে ভরে আসবার উপক্রম হয়, অনুপস্থিত চামেলির উপর একটা অকারণ অভিমান বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠে। বিশ্রী রান্নার বিস্বাদতা সে টেরও পেত না যদি না চামেলীর অনুপস্থিতিটা মনের কাছে এমন তীব্র না হত। হাতের উপরের দিকটা দিয়ে চোখ দুটা মুছ্‌তে মুছ্‌তে আহ্লাদে ছেলের মত প্রশান্ত অর্দ্ধস্বগত অভিযোগ করলে,—কতদিন ভাল রান্না খাইনে, চামেলি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল। প্রশান্ত ইজিচেয়ারে এলিয়ে অর্দ্ধনিমিলিত চোখে চেয়ে আছে। মনে মনে তীব্র আকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা করছে—এসো,

চামেলী, এসো। আমার কল্পনা থেকে বস্তুরূপ নিয়ে উদয় হও,—তেমনি করে তনুভঙ্গী করে' এসে সমুখে আমার দাঁড়াও, তেমনি তোমার দু'চোখ থেকে অন্তহীন গভীর প্রেমের দুর্ব্বার বাণী পাঠিয়ে দাও! দেখছ না কি, কেমন আমি আকুল হয়েছি?

আমিলিত চোখ প্রশান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে বিস্ফারিত করলে। কিছু দেখতে পেলে না,– রূপহীন শূন্যতা বোবা ব্যথায় ভরে আছে।

প্রশান্তের দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল—চামেলী, এস, দয়া করে এস। চাইনা তোমার রক্তমাংসের রূপ, কায়াহীন জ্যোতির্ম্ময় রূপেই এস তুমি। দেহ দিয়ে আমার কি হবে, আমি শুধু চাই তোমাকে,— তোমার জ্যোতির্মূর্ত্তি; তোমার ছায়াদেহ হলেই আমার চলবে, আমি শুধু তোমার সান্নিধ্য চাই।

প্রশান্তের গাটা শিরশির করে' উঠল। যেন মনে হল, একটা অশরীরী অস্তিত্ব তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, —তার জ্যোতি যেন প্রশান্তের মুদিত চোখেও ক্ষীণ হয়ে প্রতিফলিত হয়েচে, নামহীন একটা পবিত্র সৌরভে আমোদিত হল বায়ু।

স্বর্গ

চোখ মেলে প্রশান্ত যদি এবার দেখতে পায় জ্যোতির্ম্ময়ী চামেলীকে ? ভয় পাবে সে ? ভূতকে মানুষ চিরকাল ভীতির বস্তু বলে নির্দ্দেশ করে এসেচে, তাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েচে চিরকাল। বিগত প্রিয়জনকে তাড়াবার জন্য শান্তিস্বস্ত্যয়নের কত বিধিব্যবস্থাই শাস্ত্রে আছে। যে ছিল একান্ত প্রিয়, একান্ত আত্মীয়, মৃত্যু তাকে নিমেষে আতঙ্কের বস্তু করে' তুলেছে। প্রশান্ত ভাবতে লাগল—কেন এমন হয় ? আমার প্রিয়জনের যদি অশরীরী অস্তিত্ব থাকেই, তবে তার প্রেম কি থাকবে না ? তাকে ভয় করতে যাওয়ার চাইতে অন্ধ কুসংস্কার আর কি বেশি হ'তে পারে ? দেহটাকে ছাড়িয়ে যার ভালবাসা গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করছে, অশরীরী প্রিয়াকে সে ভয় পাবে কেন ? মূর্ত্তিমতী চামেলীকে সে যদি দেখতে পায়, চমকে সে উঠ্‌বে সত্যি,—আমাদের যুগান্তরের নির্দ্দয় কুসংস্কার পরলোকগতকে ততটা অসম্মান করবার জন্য আমাদের দেহতন্ত্রীগুলিকে তৈরি করে' ফেলেছে ; কিন্তু সংস্কার প্রশান্তকে একেবারে আছন্ন করতে পারবে না—তার প্রেম এতো দুর্ব্বল নয়। অশরীরী চামেলীকে দেখে ভয় যদি সে পায়, চামেলীরই বুকে সে মুখ লুকিয়ে ফেলবে।

স্বর্গ

একটা গভীর আকাঙ্খা নিয়ে প্রশান্ত চোখ মেললে। কিছু নেই, কিছু নেই, কোথাও কিছু নেই। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না আছে, আছে বৃক্ষছায়ার পত্রলেখা, আছে উদাস বায়ু, আছে চোখের জল। আর কিছু নেই।

জলভরা চোখে প্রশান্ত উঠে দাঁড়াল। রেলিঙের ধারে এগিয়ে গেল,—সুষুপ্ত নগরীর উপর একবার উদাস চোখ বুলিয়ে নিলে। চোখ উঠালে আকাশের পানে। নিস্পলক দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চেয়ে রইল—যেন সৃষ্টির অসীম রহস্যের যবনিকা ভেদ করে সামান্য একটুও জেনে নিতে চায়। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। হাত দুটো জোড় করে' স্তব পাঠ করার মত করে বল্‌লে—প্রভু, বুঝিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও। এ রহস্যের একটু বুঝিয়ে দাও। সৃষ্টিতত্ত্বের একটা মন্ত্র বলে দাও, প্রভু। মন দিয়ে চাইলেই গড়া যায় না, তা তো দেখতে পেলুম! তোমার কি মন্ত্র দিয়ে তুমি কল্পনাকে বস্তুরূপ দাও, অন্তত সেইটুকু শিখিয়ে দাও,—বিশ্বরহস্যের সবটা না জান্‌লেও আমার চল্‌বে।

—আট—

ছেঁড়া তার

সোনার ক্লিপ্‌ওয়ালা কলমটা পড়ে রয়েচে টেবিলের উপরে। প্রশান্ত সেটাকে ব্যবহার করে না, রেখে দিয়েচে টেবিলের উপরে এক সবৃন্ত ফুলের মত। চামেলীর কলম ওটাঃ—ওর থেকে যেন স্মৃতির এক অতি সূক্ষ্ম গন্ধ ভেসে আসে, সান্ত্বনা আনে বহন করে', বলতে থাকে, সমস্ত আবেষ্টনের মধ্যে রয়েচে চামেলীর অস্তিত্ব, সে রসের একটু ব্যত্যয় হয় নি।

ছুটীর দিনের দুপুর বেলায় প্রশান্ত বসে আছে তার শোবার ঘরে। নজরে পড়চে চামেলীর ঝরণা-কলমটা। আঙুলগুলি কেমন ছন্দিত করে', অপূর্ব্ব ভঙ্গী এনে গ্রীবায়, মুখে টেনে এনে গভীর আন্তরিকতা তেরছা-করা কাগজে কেমন করে সে লিখত।

'অত মনোযোগ দিয়ে কাকে লিখচ চিঠি ?' জিজ্ঞেস করলে প্রশান্ত।

'তোমাকে'—হেসে চামেলী জবাব দিলে!

'আমাকে ? কই, আমি কানে শুনতে পাই না, তা জানতুম না তো ?'

'কানে কানে সব কথা কি বলা যায়,—লজ্জা করে না বুঝি। তাই তো চিঠি লেখার দরকার। জিজ্ঞেস করব, তুমি আমাকে ভালবাস কিনা ? আজ সিনেমায় নিয়ে যাবে কিনা ? টেবিল-কভারটা ভাল বানিয়েছি কি না ? দেখতে কি আমি প্যাঁচার মতন ? যদি এখন তালের বড়া তৈরি করি, তুমি খাবে তো, না, বিশ্রী বলে' নাক সিট্‌কে আমায় দুঃখ দেবে।'

'খাবো না তালের বড়া', প্রশান্ত বল্লে।

'তবে কি খাবে ?'

'কাছে এসে শুনে যাও', একটু দুষ্টু হেসে প্রশান্ত বল্লে। 'ধোৎ' বলে চামেলী চিঠি লেখায় ব্যাপৃত হল। বল্লে, 'মার কাছে চিঠি লিখচি। লিখচি, শীগগির এখান থেকে আমাকে তোমরা নিয়ে যাও।—বড় অত্যাচার করচেন উনি। নইলে বিষ খেয়ে ভবযন্ত্রণা মেটাতে হবে।' বলে সে অজস্র হাসতে লাগল।

খেলাচ্ছলে চামেলী যে ভবযন্ত্রণা মেটাবার ভয় দেখিয়েছিল, সত্য হয়ে উঠল তা জীবনে। প্রশান্ত ভাবতে লাগল—নিশ্চয়ই সে অত্যাচার করেছিল তার উপরে, অন্তত স্নেহের অত্যাচার, প্রেমের অত্যাচার,—নইলে সে এমন অকস্মাৎ ছেড়ে যাবে কোন অভিমানে? প্রার্থনা করতে লাগল—অনন্ত স্বাধীনতা, অনন্ত আনন্দের মধ্যে তাকে মুক্তি দাও, প্রভু, একটু দুঃখও যেন আর আমার চামেলীর না থাকে।

যেন একটা নেশায় পেয়েছে প্রশান্তকে। চারদিকে চামেলীর গন্ধ, চারদিকে ছড়ান তার স্মৃতি, শুধু চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা তাকে,—অথচ সে যে কাছে নেই তা সম্ভবপর নয়। রয়েচে যে বুকের কাছে, তাকে খুঁজে না পাবার গভীর অস্বস্তি মনকে দিচ্চে না শান্তি। মনে মনে সে বলতে লাগল—চামেলী, দেখা দাও, দেখা দাও, অমন দুষ্টুমি করো না। মায়া হয় নাকি তোমার একটুও?

চামেলীর আলমারিটা গিয়ে খুললে প্রশান্ত। কাপড়-জামার একটা গন্ধ এল ভেসে; তার মধ্যে প্রশান্ত দেহসৌরভ খুঁজে বেড়াতে লাগল। গভীর সম্ভ্রম ও মমতার সঙ্গে উঠিয়ে নিলে সুরার-রঙের একটা শাড়ি;

এটা ছিল চামেলীর বড় প্রিয়। গালে লাগালে, মুখে লাগালে, বুকে লাগালে সেটাকে, গোলাপ ফুলের মত সেটাকে নাকের কাছে তুলে ধরে সৌরভ গ্রহণ করতে লাগল।

এক কোণায় পড়ে রয়েছে কতকগুলি চুলের ক্লিপ, কতকগুলি চুলের কাঁটা, চুল বাঁধবার ফিতে। প্রশান্ত স্পর্শ করে না ওগুলিকে ; চামেলীর চুলের গন্ধতেল হয়ত লেগে আছে এখনও ; ভয় হয় স্পর্শ করলে সেটুকু হারিয়ে যাবে,—সর্ব্বস্ব দিলেও আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা অমূল্য এই চিহ্নটুকুকে। শুধু মনে মনে বলতে লাগল—চামেলী, তুমি এত ভঙ্গুর, এত ভঙ্গুর তুমি! ওই ক্ষীণ চুলের কাঁটাগুলি, ঐ ফিতে, মুখমোছার তোমার ক্ষুদ্র রুমাল, তোমার বিয়ের সময়কার পুরান কত ব্লাউজ শাড়ি, তোমার ক্লাসে-প্রাইজ-পাওয়া আধ-ভাঙা ঐ শেলাবার-বাক্সটা, এরা পর্য্যন্ত কালের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে, আর তুমিই শুধু পারলে না,—এত দুর্ব্বল, এত অসহায় তুমি!

একটা ড্রয়ার ঠেলে খুললে। চামেলীর লেখা এক গাঁদা চিঠি রঙিন গোলাপের পাপড়ি দিয়ে ঢাকা রয়েচে। একটা চিঠি উঠিয়ে নিলে প্রশান্ত। চামেলীর হাতের

বাঁকা বাঁকা অক্ষরে প্রশান্তের নামটা লেখা রয়েচে। ভেতরের চিঠিটা একবার টানতে গেল প্রশান্ত ; বের করলে না, শুধু খামটা মুখের কাছে উঠিয়ে চামেলীর লেখা অক্ষরগুলির উপরে ঠোঁটটা বুলিয়ে নিলে।

মনে হল, যেন আলমারির দরজা খুলে চামেলীর জগতে এসে পড়েচে। সর্ব্বত্র চামেলীর আধিপত্য, চামেলীর অস্তিত্বের স্পর্শ, চামেলীর উপস্থিতির সৌরভ। এখান থেকে চলে যেতে আর ইচ্ছেই হয় না,—মনে হয়, হঠাৎ যেন চামেলীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, যেমন সঙ্গীতমুখরিত, মন্ত্রধ্বনিপূত, যজ্ঞাগ্নিশিখাদীপ্ত বিবাহসভায় এক বসন্ত রজনীতে স্বপ্নের মত প্রথম দেখা হয়েছিল।

ছোট্ট একটা কাগজের বাক্স আবিষ্কার করলে প্রশান্ত। তার ওপরে চামেলীর হাতে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা—ছিন্নতার। কৌতূহলী হয়ে উঠল প্রশান্ত—বুঝতে পারলে না ব্যাপারটা কি।

খুলে দেখলে এস্রাজের একটা বড় তার কুণ্ডলী করে' রয়েচে। একটা বসন্তরজনী মনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তে উড়ে এল।

চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। সমস্ত ধরণী পরিব্যাপ্ত করে ছিল এক অদৃশ্য মল্লিকার কলি,—আজ ফুটে উঠল,

রূপে, গন্ধে, মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায় কী সুধা যে টেনে আনল, তাকে ভাষায় প্রকাশ করবে কার সাধ্য।

রাতের খাওয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সমাপ্ত হয়েচে। শোবার ঘরে এসে চামেলী তার বালিশ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ করেচে,—এটা শুয়ে পড়বার ভূমিকা, প্রশান্ত বুঝতে পারলে।

বল্লে,—ঘুমতে যাচ্চ নাকি এখনি ?

'যাবই তো', একটু লজ্জিত হয়ে বল্লে চামেলী, 'রাত বুঝি কম হল,—একেবারে সাড়ে নটা ; এ আর চালাকি নয়। ডাক্তারী-শাস্ত্রে লেখা আছে, শীগগির করে রাত্রে শোবে,—নইলে ডাক্তারেরা পয়সা পাবে কেমন করে ?'

'চল, ছাদে বসে একটু এস্রাজ বাজিয়ে শোনাবে, মিলি।'

'এত রাত্তিরে ছাদে গেলে কি হয়, জান ?'

'কি হয় ?'

'ভূতে ধরে।'

'ধরুক।'

জ্যোৎস্নামাখান ছাদে গালিচা বিছিয়ে দিলে। এস্রাজটা কোলে টেনে বসলে চামেলী, প্রশান্ত তার পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়ল।

স্বর্গ

তারের উপরে ছড়ের একটা টান দিয়ে চামেলী শুধোলে,—বল, কি সুর বাজাব ?

'মাটী করেছ', সাতঙ্কে বল্লে প্রশান্ত, 'ওদের সব নাম-টাম কি আমি জানি ? ভৈরবী পূরবী যা হয় একটা হোক। শুনতে ভাল লাগলেই হল।'

'তবে এতদিন তোমাকে শোনালুম কি ? ঠিক মত একটা নামও বলতে পারবে না,—বেনাবনে শুধুই মুক্তো ছড়িয়ে বেড়াচ্চি ?'

'নামটা হল সব চেয়ে অবান্তর,—এস্রাজের সঙ্গে ভাষার সঙ্গে ঝগড়া, তাই সুরের নাম ভুলে গেলে দোষ হয় না কোনও। কিন্তু বিচার করব মন দিয়ে,—ঠিক সুরটি না বাজালেই বলবো, ভুল হচ্চে। তখন বুঝতে পারবে, সুর আমি চিনি কিনা !'

'বেশ,' বলে হেসে চামেলী ভূপালীর আলাপ ধরলে।

জ্যোৎস্না ছিল স্থির নিজ্জীব, তারের ঝঙ্কারে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল ; মূর্ত্তি পেল সুরের, ভূপালীর মন্ত্রে প্রাণ পেল। স্বর্গ কোথায় ?—ধরণীতে ? আকাশেতে ? মনের মধ্যে ? এই সুরের মন্ত্র কী অসাধ্য সাধন করতে পারে ! কোন্ অদৃশ্য থেকে এক স্বপ্নাতীত কল্পনাতীত জগতকে মুহূর্ত্তে টেনে নিয়ে এল অবলীলাক্রমে, একটু

আগে কে বুঝতে পেরেছিল, এমন অপূর্ব্ব ভুবন হাওয়ার মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল।

তারের বুকে ছুটে চলচে চামেলীর আঙুল, কাঁপছে ছায়া, শিউরে উঠছে জ্যোৎস্না, চোখ বুজে বুজে প্রশান্ত ঝঙ্কৃত হয়ে উঠচে।

'আরও, আরও মিলি, থেমো না।—শুধু বাজাও, কেবলই বাজাও—সমস্ত রাত ধ'রে সৃষ্টি কর তোমার স্বপ্নের ভুবন। চামেলী! চামেলী!'

কেঁপে কেঁপে, শিউরে শিউরে, মীড়ে মীড়ে ভূপালী রচনা করচে নতুন স্বপ্ন, নতুন জগৎ, অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-তরঙ্গ।

'আরো, চামেলী, আরও—অদ্ভুত যাদু জান, চামেলী, সবটা দেখাতে হবে আজ!'

সহসা ঝন্ করে একটা শব্দ হল। তার গেল ছিঁড়ে।

'ঐ যাঃ', বলে চামেলী থেমে গিয়ে হাঁপাতে লাগল।

প্রশান্ত চমকে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি তাকাল চামেলীর মুখের পানে,—কী করুণ হ'য়ে উঠেচে চামেলীর মুখ।

'কি হল, মিলি?'

'তার ছিঁড়ে গেছে।'

'মিলি, স্বর্গ এসেছিল নেমে। হঠাৎ তার ছিঁড়ে পালিয়ে গেল কেন?' সনিঃশ্বাসে প্রশান্ত বল্লে।

চামেলীও করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেললে। বল্লে—স্বর্গের দেবতারা সব হিংসুটে কি না,—তাই মর্ত্ত্যে স্বর্গের আনন্দ এসে পৌঁছলে ওঁরা সহ্য করতে পারেন না,—বাধা দেন, ভেঙে দেন।' বলে জ্যোৎস্নার মধ্যে একটু হাসতে চেষ্টা করলে।

আলমারিটার দরজাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে প্রশান্ত ভাবতে লাগল,—দেবতারা সহ্য করতে পারেন না মর্ত্ত্যে স্বর্গের উদয়,—তাই তার ছিঁড়ে দেন, চামেলীকে ছিঁড়ে দিলেন!

—নয়—

অভিমানিনী

চামেলীর মৃত্যুর পর প্রায় একটা বছর চলে যেতে বসেচে, কিন্তু প্রশান্তের এখনও বিশ্বাস হয় না, চামেলী আর নেই। মনে হয়, সে লুকিয়ে আছে কোথাও, কৌতুক করে প্রশান্তকে কাঁদাচ্চে, মিলনকে মধুরতর করবার জন্য বিরহের যবনিকা ক্ষণিকের জন্য দিয়েচে টেনে', সমাপ্ত সে হয়নি।

পরজন্ম যদি থাকে, যদি প্রেম মৃত্যুতে লয় না পায় তবে চামেলীকে আহ্বান করা নিরর্থক ক্রন্দন হবে না। মৃত্যূত্তর কোন অস্তিত্ব যদি চামেলীর থেকে থাকে, প্রশান্তের আহ্বান কি সে উপেক্ষা করতে পারে? স্ত্রীর যে পরিচয় প্রশান্ত পেয়েচে তাতে সে স্থিরনিশ্চয়, সম্ভবপর হলে—মৃত্যুর পরপারে কোনও অস্তিত্ব থাকলে—চামেলী যেমন করে হোক্ একবার তাকে সান্ত্বনা

দিয়ে যাবেই। ভগবানের আদেশ চামেলী উপেক্ষা করতে পারে, তবু তার প্রার্থনা উপেক্ষা করবে না কোনও দিন। যদি না আসে চামেলী, প্রশান্তের আকুল আহ্বানের কোনও সাড়া না এসে পৌঁছায়, যদি চামেলীর অশরীরী অস্তিত্বের কোনও ইঙ্গিত তার কাছে না আসে, তবে সে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করবে, পরজন্ম একটা মিথ্যা কল্পনা। চামেলীর প্রেমের ওপর তার অতটা নির্ভরতা আছে।

কিন্তু সুদীর্ঘ একটা বৎসরের মধ্যে কোনও ইঙ্গিত এল না তার কাছে, দেখলে না কোনও ছায়ামূর্ত্তি, টের পেলে না কোনও প্রিয় উপস্থিতি। প্রশান্তের সহস্র প্রার্থনা, অপরিমিত আকুলতা, দুর্ব্বার আগ্রহ সমস্ত ব্যর্থ হয়েছে।

তবে কি সে এই সিদ্ধান্ত করবে, পরজন্ম বলে কিছু নেই : পরলোক একটা কাল্পনিক সান্ত্বনা ? যার বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনও প্রমাণ নেই, তাকে সে বিশ্বাস করবে কোন্ সাক্ষ্যপ্রমাণের জোরে ? অবশ্য তার বুদ্ধির অতীত, অনেক কিছু থাকতে পারে ; কিন্তু কি আছে, জীবাত্মা আছে না ইলেকট্রন আছে, স্বর্গ আছে না বর্ণহীন রূপহীন ইথর্ আছে, চৈতন্যময় ভগবান আছেন না স্বয়ংক্রিয়

কতগুলি অন্ধ শক্তি আছে এ বিষয়ে কোনও নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই অনিশ্চয়তা থেকে প্রশান্তের পক্ষে কোনও সান্ত্বনা লাভ করা সম্ভবপর নয়।

তাই আজ গভীর রাত্রে তার বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ারে এলিয়ে অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় প্রশান্ত মনে মনে প্রার্থনা করছে,—'চামেলী, একবার এসে দেখা দিয়ে যাও,—শুধু একবার এস দয়া করে'। একবার মূর্ত্তিমতী হয়ে ওঠো। ভবিষ্যতের জন্য আশা করবার কিছু দাও,—দার্শনিক অনিশ্চয়তার পথে দিশেহারা হয়ে আর চলতে পারি না,—একটু সান্ত্বনা পাইনে মনের মধ্যে। এই মধ্যযাম নিশায় এই অখণ্ড নিস্তব্ধতা ও পরিপূর্ণ নির্জ্জনতার মধ্যে জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তিতে তুমি শুধু একবার এসে দাঁড়াও। অন্যায় আব্দারের নির্দ্দয়তায় বারবার তোমাকে পীড়িত করবো না।'

প্রশান্ত ভাবতে লাগল, এমন দুষ্টু হয়েচে চামেলী : এমন নির্দ্দয় দুষ্টুমি তো সে আগে কখনও করে নি। চামেলী যখন অভিমান করতো, তাকে কথা বলান খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু প্রশান্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি সহজ প্রক্রিয়া শিখে নিয়েছিল। সেগুলির ব্যবহারে আশাতীত শীঘ্র ফললাভ করা যেত।

স্বর্গ

আজ সুদীর্ঘ বৎসর ধরে অভিমান করে রয়েচে চামেলী, তীব্র আকুল প্রার্থনায় পর্য্যন্ত সাড়া দিচ্চে না: মৃত্যু-আড়ি করেচে তার সঙ্গে। কিছুই করা যাচ্ছে না; একটু সাড়া নেই, শব্দ নেই: গন্ধ নেই, ভঙ্গি নেই দেহের, অভিমানের প্রকাশ্যতা নেই একটুও—এ অভিমান ভাঙান যাবে কেমন করে?

প্রশান্ত দুষ্টুমির একটু হাসি হাসলে। মনে মনে বল্‌লে, 'দাঁড়াও, তোমার অভিমানটা আমি বের করচি। জানি না বুঝি আমি, কি তোমার দুর্ব্বলতা? আড়ি ভাঙাবার কম কৌশল বুঝি শিখেছিলাম। দাঁড়াও, কেমন জব্দটা কর্‌চি দেখ।'

প্রশান্ত ইজিচেয়ারে নড়ে চড়ে বস্‌লে। বল্‌লে, মিলি, তোমার ইলাকে মনে আছে? সেই যে আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত ইলা? আজ দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে গঙ্গার ধারে। এখনও তার বিয়ে হয় নি,—একটু যেন রোগা হয়েচে; কিন্তু আগের চাইতে ফর্শা হয়তো একটু বেশিই হবে। শ্যাম্পেন রঙের শাড়িটা বেশ মানিয়ে ছিল:—আর কী মস্ত দুটো কর্ণাভরণ! সুন্দর লাগ্‌ল ডিজাইনটা। তেমনি চটপটে আছে, কথা বলতে হলেই এমন দেহভঙ্গী করবে যে ওর নাচিয়ে-মেয়ে হওয়া উচিত

ছিল। ও হরি, ও তো সত্যি নাচ্‌ত। আমি নিজে দেখেচি ওর নাচ।

'একগাল হেসে বল্লে, 'উঃ কদ্দিন দেখা হয়নি,—কোথায় লুকিয়ে ছিলেন এত দিন?' বল্লুম, নানান কাজে ঘুরতে হয়। চোখটায় দুষ্টুমির ঝলক দিয়ে সে বল্লে, ঈস্‌, এত কাজ? এবার কবে আসচেন আমাদের বাড়ি, বলুন। কত নতুন গান শিখেচি, জানেন?—ওস্তাদ হয়ে গিয়েচি।

'মেয়েদের মায়াবিনী কেন বলে জান মিলি? ইলাকে দেখ্‌লেই বুঝতে পারতে। সত্যি বলচি, ওর কাছে যেতে ভয় হয়। তবে অনেক দিন পড়েছি এক সঙ্গে—সেদিক দিয়ে ওর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা অশোভন দেখায়। সত্যি, যাব একদিন, মিলি?'

বলে নিমীলিত চোখে প্রশান্ত উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করলে। চামেলী বেঁচে থাক্‌লে নিশ্চয়ই রেগে বল্‌তো,—'যাও না, কে তোমায় মানা করচে।' প্রশান্ত বলত,—আহা, রাগ করচো কেন? অবিবাহিতা কোন তরুণীর কাছে যেতে হলে প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষের উচিত স্ত্রীর অনুমতি নেওয়া।' 'যা ইচ্ছে করো', সাভিমানে চামেল বলত, 'আমার বয়ে গেল কিছু বলতে!'

এমনি করে বাক্‌হীনা চামেলীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠ হতে বাণী বের করা হত। তারপর আরও একটু চটিয়ে দিতে পারলে, ইঙ্গিতে ইলার গুণপণার একটু প্রশংসা, তার বিদ্যার একটু তারিফ, তার সপ্রতিভতার একটু উল্লেখ ও প্রশান্তের প্রতি তার একটা অস্পষ্ট পক্ষপাতিত্বের ধূমেল আভাস দিতে পারলে, আর ভাবনা ছিল না।

আজ প্রশান্ত পেলে না কোনও জবাব, ইলার প্রতি প্রশান্তের কাল্পনিক আগ্রহের কাহিনীতে কেউ চটে উঠল না, একটু ঈর্ষিত আগ্রহ উদ্দীপিত হল না কারো,—চামেলী যেমন মৌন ছিল, তেমনি মৌন রইল—তেমনি রহস্যান্ধকারে আবৃত, তেমনি নির্লীপ্ত ঔদাসীন্যে মূক।

'চামেলী, শুনচ? আচ্ছা, তুমিই বল না, সিগ্রেট খেলে দোষটা কি? বিস্তর লোক তো খায়। আচ্ছা না হয়, প্রত্যেকবার আমি টুথ্‌পেষ্ট দিয়ে মুখ ধোব। দেখতে বিশ্রী লাগে? জাননা বুঝি, ফ্যাসান করার জন্যই তো সবাই প্রথম সিগ্রেট ধরে। আমি বুঝতে পেরেছি এবার কি তুমি বলবে। এত কোটি কোটি লোকের লাঙ্‌স্‌ খারাপ হল না, আমার খারাপ হতে যাবে কোন্‌ আক্রোশে?'

'একা একা বড় বিশ্রী লাগে চামেলী, ভাবছি এবার থেকে সিগ্রেট ধরব। নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে কিছু একটা করার হবে। এক কৌটো কিনে নিয়ে এসেচি, কাল থেকে সুরু করবো ভাবচি।'

প্রশান্ত একবার মিটিমিটি করে চেয়ে দেখ্‌লে। কিছুই দেখতে পেলে না। চোখ বুজে কান পেতে রইল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে, কোনও প্রতিবাদ শুনতে পেলে না। কোনও শাসন-বাণী এল না কানে।

সিগ্রেটের ওপর চামেলীর যা আতঙ্ক ছিল তা দেখে না হেসে উপায়ই ছিল না। তাই নিয়ে প্রশান্ত তাকে কম রাগাতো না।

'গিয়েছিলাম চৌধুরীদের বাড়ি। চা খেলাম আর একটা নতুন জিনিষ।'

'নতুন জিনিষ কি এল আবার?'

'তোমার গিয়ে একটা ইয়ে,—রাগ করো না লক্ষ্মীটি,—একটা সিগ্রেট।'

চকিতে চামেলীর মুখের হাসি গেল মিলিয়ে, তার আগ্রহ হল তিরোহিত, এক দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বল্‌লে—লজ্জা করে না সে কথা বলতে, আবার জানিয়ে বীরত্ব করা হল!

প্রশান্ত বল্‌লে—খেয়ে বীরত্ব হয়নি বটে, না খেলে কাপুরুষতা করা হত।

'চুরুট না খেলে কাপুরুষতা হল বৈ কি', সব্যঙ্গে ওদিকে মুখ ফিরিয়েই চামেলী বল্‌লে।

'হতো না? চৌধুরির বোনটা পর্য্যন্ত চুরুট টানলে, আর পুরুষ হয়ে আমিই প্রত্যাখ্যান করবো?'

'এমন মিথ্যে কথা বলতে পার তুমি', বলে কৌতুকে দুচোখ প্লাবিত করে চামেলী মুখ ফেরালে।

'খায়নি?' প্রশান্ত বল্‌লে, 'অবিশ্বাস করচ? নিশ্চয়ই খেয়েচে: তবে আমি খাইনি।'

'সিগ্রেট খেলে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতুম কিনা!' সহাস্যে চামেলী বল্‌লে।

সেই চামেলী আজ তার সিগ্রেট ধরবার সংকল্পের কথা শুনে নিশ্চুপ রইল—একটু শাসন করলে না, ক্ষীণতম প্রতিবাদটুকু করলে না।

এর পরও প্রশান্ত কি করে বিশ্বেস করবে চামেলী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, বায়বীয় দেহে তার কাছে পর্য্যন্ত আস্‌তে পারে।

প্রশান্ত বল্‌লে—মিলি, আজ রাতে আমি খাইনি। কেন খাব? এমন বিশ্রী করে রাঁধ্‌লে কেউ খেতে পারে।

খাবই তো না,—কিছুতেই খাব না। তুমি কি একটুও খোঁজ নাও আমি কি খেলুম আর না খেলুম।

প্রশান্তর খাওয়ায় যাতে একটু অসুবিধে না হয়, রান্না যাতে তার একঘেঁয়ে না লাগে, পেট যাতে তার পুরোপুরিই ভরে, একটু মাত্র কম খাওয়া না হয়, চামেলীর ছিল তা আরাধনা,—তার প্রাত্যহিক শিবপূজা। আজ প্রশান্ত উপবাসী আছে শুনেও সেই চামেলী জবাব দিলে না,—গভীর ঔদাসীন্যে চুপ করে রইল।

ঝর ঝর করে প্রশান্তের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কোনও সান্ত্বনাই আর খুঁজে পেল না। একটু আশ্বাসও পেল না কোথাও। চামেলী জবাব দেবে না তার আহ্বানে, নিশ্চুপ থাক্‌বে তার আকুতিতে, প্রশান্তের ওপর সমস্ত অধিকার, প্রশান্তের জন্য সমস্ত আগ্রহ সে এমনি অবহেলায় উঠিয়ে নিয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেচে? দেহ ও প্রেম দুইই কি সমান ক্ষণস্থায়ী?

মধ্যরাত্রেই প্রশান্ত বারান্দায় জোরে জোরে পায়চারি করে' বেড়াতে লাগল। মাথাটা কি বিশ্রী তেতে' উঠেচে। মন যত বেশি আকুল হয়ে ওঠে, হতাশা ততই তীব্রতর হয়ে ফিরে এসে আঘাত করে।

এমন সময় এল নিদ্রালু শীতল বায়ু দক্ষিণ দিগন্ত থেকে। মাথাটাকে অর্দ্ধেক স্নিগ্ধ করে দিয়ে গেল। প্রশান্তর সহসা মনে হল,—বায়বীয়া চামেলীই এই পরিচর্য্যা পাঠালে না তো! এমনি করেই কপালে আঙুল বুলিয়ে সে কত দিন প্রশান্তের উষ্ণ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করেচে।

যদি চামেলী সত্যি কোনও অপূর্ব্ব জগতে বেঁচে থাকে? ইচ্ছে করলেই কি সেখান থেকে আর সাড়া দেওয়া যায়! প্রশান্তের সমস্ত আকুলতা নিয়েও যেমন সে পৌঁছাতে পারে না চামেলীর কাছে, চামেলীও হয়তো তার সমস্ত প্রেম, সকল আগ্রহ সত্ত্বেও তার কাছে এসে পারে না পৌঁছতে। সেই নতুন জগতের নিয়মাধীনে তাকে থাক্‌তে হয়। চামেলীর বিরহে যেমন প্রশান্তের প্রেম মরে নি, তেমনি চামেলীর প্রেম হয়তো একটুও ম্লান হয়নি,—কৌস্তুভমণির মত তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিম্বা হয়তো চামেলী রয়েচে তার পাশেই, কিন্তু তাকে দেখবার শক্তি নেই প্রশান্তের চোখ দুটোয়!

প্রশান্ত শিউরে উঠ্‌ল। অসম্ভব নয়, কিছুই অসম্ভব নয়। তাই যেন হয়,—ভগবান তাই যেন হয়।

স্বর্গ

চেয়ারটায় এসে প্রশান্ত বসে পড়ল। বল্লে, চামেলি, মিথ্যে কথা বলেচি, ইলার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি,—চুরুট ধরার ইচ্ছে আমার একটুও নেই,—কৌটো কিনে আনার কথাটা আমার বানান। বিকেলে খাওয়া সেরে নিয়েছি বলে আজ রাতে আর খাইনি,—কাল থেকে ঠিক খাব। শুধু তুমি রাগ করো না।

—দশ—

পরজন্ম

একটু আগে বন্ধু অপূর্ব্ব চলে গেছে। চায়ের শূন্য পেয়ালা দুটো সামনে পড়ে রয়েছে,—তার ভিতর চুরুটের ছাই, আর দেশ্‌লাইয়ের কাটি।

ইজিচেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে প্রশান্ত ভাবছে। চামেলীর মৃত্যুর পর প্রশান্ত বেশি বের হয় না,—আফিস থেকে ক্লান্ত দেহটা বহন করে এনে কোন রকমে বারান্দার এই চেয়ারটাতে পড়ে। রাত একটা দুটো বেজে যায়। নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে বাইরে,—কখনও ভাবে, ভাবনা-হীন চেয়ে থাকে কখনও, পুরাতন স্মৃতির ইন্দ্রধনু-রঙিন প্রদেশে স্বপ্নগ্রস্তের মত ঘুরে বেড়ায়, উদ্গত অশ্রুর আবেগ চেপে ফেলে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে।

যারা তার এই নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনের মধ্যে মাঝে মাঝে এসে উপস্থিত হয়, অপূর্ব্ব তাদের মধ্যে প্রধান।

স্বর্গ

বন্ধু সংখ্যা প্রশান্তের চিরদিনই অল্প,—তার এড়িয়ে-চলা প্রকৃতি, ভাবপ্রবণতা, নিঃসঙ্গতাপ্রিয়তা, এবং সব চেয়ে বেশি লাজুক স্বভাব বন্ধুসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক নয়। শুধু যারা নিবিড় করে জেনেচে তাকে, তারা বেসেছে তাকে ভাল,—তার বৈরাগ্যের মধ্যে রসের সন্ধান তারাই শুধু আবিষ্কার করতে পেরেচে।

চিরনিঃসঙ্গ প্রশান্তের সর্ব্ব প্রথম বন্ধু হল তার স্ত্রী চামেলী। ভিতরে ভিতরে, নিজের প্রায় অজানিতে প্রশান্ত এক অবর্ণনীয় স্বাচ্ছন্দ্য উপলব্ধি করলে। প্রিয়ার চাইতে বেশি প্রয়োজন তার মিতার, নারীর চাইতে বেশী প্রয়োজন তার সহচরীর। চামেলী বুঝেছিল সে কথা,—হাসি দিয়ে, সঙ্গীত দিয়ে, গল্প দিয়ে, জীবনের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গধারায় প্রশান্তের স্বভাববিষণ্ণতাকে সে ঢেকে ফেলতে চেয়েছিল। প্রশান্তকে নিয়ে চামেলী মিছিমিছি কেন পরিহাস করতো, অকারণে চটিয়ে দিত কেন, কেনই বা প্রশান্তের বিরক্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করে' বিঘ্ন ঘটাতো তার পাঠে, তার চিন্তায়, চঞ্চলতা দিয়ে গাম্ভীর্য্যের সম্ভ্রম হানি করতো, চামেলীকে হারিয়ে আজ প্রশান্ত তাদের তাৎপর্য্য বুঝতে পেরেছে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা দূর হল না,—জন্মকালে বিধাতাপুরুষ যাকে

তৈরি করেছিলেন একলা পথচলার জন্য, কে তাকে ডেকে আন্‌বে প্রেমের মধ্যে, মানুষের সৌহার্দ্দ্যের ভেতর। চামেলী একদিন মহাকালের মহারহস্যের মধ্যে হারিয়ে গেল।

মরুপথের যাত্রী বালুর ঝড়ে অন্ধ হয়ে ওয়েসিসকে ফেলল হারিয়ে, সুরতৃষ্ণাকাতর মন পথিকের বাঁশি শুনে উৎসুক হয়ে উঠেছিল, পথিক গেল চলে ; বন্ধু এসে পৌঁছিল মনের দুয়ারে, নাড়া দিয়েই পালিয়ে গেল, দাঁড়াল না। অপূর্ব্ব বলেছে, এমন করে বেদনার রোমন্থন করে' কোন্ সার্থকতা ? জীবনটাকে নষ্ট করে' লাভ কি ?

নষ্ট না করে জীবনটাকে দিয়ে করবেই বা কি প্রশান্ত ? যে জীবনের মূল্য এক কাণাকড়ি নয়, তাকে সম্মান দেখাতে যাবে সে কোন্ মূর্খতায় ? স্বপ্ন দিয়ে রাঙালাম যে জীবনকে, কৃচ্ছ্রসাধন করে গড়লাম যার বনিয়াদ, প্রাণান্ত করে সুখে রাখতে চাইলাম যাকে, ত্যাগে সংযমে সহানুভূতিতে প্রেমে যাকে সৌরভদানের প্রচেষ্টা করলুম, সে তো হাওয়া,— বর্ণহীন ইথরের মধ্যে তা সমুদ্রে জল-বিন্দুর মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ! একটা বিরাট ব্যর্থতার রঙ্গমঞ্চে জীব অর্থহীন ভূমিকার অভিনয় করে' যাচ্ছে।

স্বর্গ

ক্ষণস্থায়ী জীবনে আনন্দের অবসর কতটুকু ? আছে দারিদ্র্য, আছে অস্বাস্থ্য, আছে মানুষের অত্যাচার, আছে বিধাতার অত্যাচার।

এখনও জগতে আছে সঙ্গীত, এখনও সোনালী রৌদ্র শরতের শস্যক্ষেত রোমাঞ্চিত করে' তোলে, বর্ষা কাজ্‌রি বাজায় আকাশের কোণায় কোণায়, চৈত্র-জ্যোৎস্না ধরণীকে স্বপ্ন দেখায় প্রেমের: প্রাণের আনন্দে শিশু চিৎকার করে এখনো, তরুণতরুণী চিন্তাহীন কলহাস্যে বায়ুকে করে স্পন্দিত, জগত থেকে বিদায় নেয়নি কৌতুক, বিদায় নেয়নি কারণহীন পুলকস্পন্দন ; কিন্তু প্রশান্তের কাছে তাদের আবেদন নিস্ফল হয়েচে। এত স্বার্থপর হবে সে ? চামেলীর নেই যা ভোগ করবার অধিকার, কোন্ নির্লজ্জ স্বার্থপরতায় সে তাদের রসাস্বাদন করতে ছুট্‌বে ?

চামেলীর মৃত্যুর পরেও এই যে প্রশান্ত বেঁচে আছে সেটা তার কাছে একটা অন্যায় অনধিকারের মত মনে হয়। শুধু কি তাই ? লজ্জা হয় না! অপমান হয় না! এক অজানা স্বেচ্ছাচারী শক্তি তোমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমার প্রিয়াকে, একবার তোমার মতামত পর্য্যন্ত জিজ্ঞেস করলে না, ঠিকানা পর্য্যন্ত দিয়ে

গেল না—তোমার পৌরুষের প্রতি এর চাইতে অধিকতর স্পর্দ্ধিত রূঢ়তা আর কি হ'তে পারত !

চামেলীর মৃত্যুর পরে প্রশান্ত ভেবেছে সে আত্মহত্যা করবে কি না ? আত্মহত্যা নাকি পাপ ! কেন পাপ ? কে বলেছে পাপ ? ধর্ম্ম বলচে, ঈশ্বর তোমাকে তৈরী করেছেন এক গভীর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তোমার উপযুক্ত এক মঙ্গলময় পরিণতির দিকে মহাকাল তোমাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তোমার অধিকার নেই সে উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবার। সমাজ বলচে, কর্ত্তব্য আছে তোমার সমাজের প্রতি, তোমার চেষ্টায় সমাজ হ'তে পারবে সমৃদ্ধতর, মানুষ হবে উপকৃত—নিজ জীবন নষ্ট করার তোমার অধিকার নেই।

জীবনের কি সত্যই কোনও উদ্দেশ্য আছে ? ইজিচেয়ারটায় শুয়ে শুয়ে প্রশান্ত শুধুই ভাবতে লাগল। অর্থহীন মৃত্যু, পরজন্মহীন অবসান ছাড়া জীবনের অন্য কোনও পরিণতি কি সত্যই আছে ? মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন প্রমাণ তো এখনও হয় নাই। আমার ব্যক্তিত্বের যদি মৃত্যুর পরে আর অস্তিত্ব না থাকে, তবে জীবনের অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, অগ্রসরহীন, পূর্ণতাহীন শিশুলীলাভিনয় করার কী সার্থকতা ? মানুষকে যদি করতে হয় কর্ত্তব্যে

আন্তরিক, মনুষ্যত্বে শ্রদ্ধাবান, আত্মোন্নতির দুর্গম পথে তীর্থযাত্রী, তবে পরজন্ম একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে কি ?

অন্ধকার বারান্দাটায় চেয়ারটাতে অর্দ্ধনিদ্রিত হয়ে শুয়ে শুয়ে প্রশান্ত বলতে লাগল,—চামেলী, তুমি একবার এসে প্রমাণ করে' দাও পরজন্ম শুধু একটা দার্শনিক গোঁজামিল নয়, পুরোহিতমণ্ডলীর ধাপ্পাবাজী নয়, এর অস্তিত্ব মৃত্যুর মতই সত্য। যুগযুগান্তের সন্দেহ ও অবিশ্বাস তুমি এসে দূর করে দাও চামেলী। এই জীবন্মৃততার মধ্য হ'তে আমাকে উদ্ধার করো।

'চামেলী ! তুমি !'

'বাঃ রে, চিনতে পারচ না বুঝি ?'

'ওঃ চামেলি, তবে সত্যি আছ তুমি, শেষ হও নি ?'

'বেশ তো, শেষ হ'তে আমি গেলুম কেন ?'

'মিলি, আনন্দ আমি কোথায় রাখ্‌ব ? আশা করতেও যে ভয় পেয়েছি আমি,—অসহায় বেদনায় উপায়হীন অনুশোচনীয় কি কান্নাই কেঁদেছিলুম চামেলী,—ভগবানকে পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে গালাগালি করেছি, অধৈর্য্য হয়ে অবিশ্বাস করেছি চামেলী। আমি সত্যি স্বপ্ন দেখছি না তো মিলি ?'

স্বর্গ

'স্বপ্ন কোনটা, প্রিয়? যা আগে দেখছিলে না যা দেখচ এখন্? এই তো আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে,—তবে ভাবনা করচ কেন?'

'মিলি, কোথায় ছিলে এতদিন আমায় ফেলে,—আমার ব্যথা কি তুমি বুঝতে পার না?'

'তুমিই তো বলতে, বিরহ আমাকে মধুরতর করে তোমার কাছে।'

'মিলি, দুদিনের বিরহের কথা বলতুম আমি।'

'এ ও তো দুদিনেরই বিরহ। মহাকালের অসীমতার মধ্যে জীবনের এক'টা বছর কতটুকুই বা।'

'মিলি।'

'কি?'

'বড় কষ্ট হয়।'

'দূর! এমন মিছিমিছি দুঃখ দিতে পার নিজেকে। একবার চেয়ে দেখতো আমার দিকে: কেমন আমার গায়ের রঙ হয়েচে দেখেচ? বসন্তের জ্যোৎস্না দিয়ে তৈরি? তুমি বলতে না, আমি নাকি তেমন ফর্শা নয়?'

'মিথ্যে কথা বলো না মিলি। আমি কবে বলেছি তুমি ফর্শা নও?'

স্বর্গ

'দেখচ না, কেমন চাঁপার কলির মত আমার আঙুল হয়েচে—কেবল উপমায় নয়, সত্যি সত্যি চাঁপার কলি। এই দেখ আমার বেণী,—বাস্তবিকই মেঘজাল দিয়ে আমি তৈরি করেচি ; নববসন্তের দুর্ব্বাদল দিয়ে আমার এই ওড়না বানান হয়েচে। বিদ্দ্যুল্লতার মত আমি অনায়াসে চলে যেতে পারি হিল্লোলিত স্বচ্ছন্দে। একবার আমার চোখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ, কত স্বচ্ছ হয়ে উঠেচে তারা? বুকের মধ্যটা পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমার যে প্রেম মুগ্ধ করেছিল তোমাকে, তা পূর্ণতর হয়ে উঠেচে : একটুও তাতে আর খাদ নেই।—বাতাসে পাচ্ছ না তার গন্ধ? বিধাতাপুরুষ তার সমস্ত ত্রুটি এবার সংশোধন করে দিয়েচেন। আক্ষেপ করবে তুমি কেন?'

'বাবু, খাওয়ার হয়েচে।' প্রশান্তের চাকর এসে বল্লে। চমকে উঠল প্রশান্ত। চলে গেল চামেলী, ভেঙে গেল স্বপ্ন।

'পালা এখান থেকে', প্রশান্ত আহত হয়ে বল্লে।

ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপাশে বাঁকা চাঁদটা অস্ত যাবার উদ্যোগ করচে। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না অন্ধকারের সঙ্গে মিতালী করে নিলে। বড় কোমল, বড় স্নিগ্ধকরুণ রাত।

স্বর্গ

চোখ বুজে প্রশান্ত চামেলীর চেহারাটা টেনে আন্‌লে। বল্লে, চামেলী, চাইনে আমি ত্রুটিহীন তোমাকে। তোমার সমস্ত অসম্পূর্ণতা নিয়ে তুমি এস আমার অতি কাছাকাছি, আমার প্রত্যহের, প্রতিক্ষণের মধ্যে। ত্রুটিহীন পূর্ণতা হতে গিয়ে কত দূরে যে চলে গেছ!

স্বর্গ

—এগার—

স্বর্গ

প্রশান্তের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। সমস্ত দেহের মধ্যে একটা আলোড়ন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল,—যেন এক বিভৎস ভূমিকম্পের সূত্রপাত হয়েছে। উর্দ্ধস্বরে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হচ্চে, স্বর বেরুচ্চে না কণ্ঠ দিয়ে, অব্যক্ত যাতনায়, যেন সে চূরমার হয়ে গেল বলে। কানে পশচে না শব্দ, দৃষ্টি গেল অন্ধ হয়ে, চৈতন্যের মধ্যে এক রন্ধ্রহীন অমাবস্যা যবনিকা টেনে দিলে। 'শেষবারের জন্য শুধু টের পেলে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুতদ্রুত গতির আবেগ।

'চামেলী !'

'আমিই তো,—চিনতে পারচ না ?'

'এখানে এলে তুমি কেমন করে ?'

'তোমার কাছে আমি আসব না, আসবে কে ?

'কিন্তু তুমি তো মরে' গিয়েচ !'

'তুমিও তো মরে গিয়েচ।' হেসে চামেলী বল্লে।

'ধেৎ।'

'নইলে তুমি এখানে আসবে কি করে? চেয়ে দেখতো, কোথায় তোমার পৃথিবীর মাটী, কোথায় মাথার ওপরের আকাশ?'

'চামেলী, সত্যি, তবে সত্যই এসেচি পরলোকে? পরজগত একটা মস্তিষ্কবিকার নয়? পেলুম তোমাকে মিলি?'

'বিশ্ববিধানে তাই তো ব্যবস্থা ছিল। জন্মজন্মান্তরে আমাদের মিলন অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। তুমিই তো মিছিমিছি এতদিন পৃথিবীতে কেঁদে কাটিয়েছ,—আমাকেও ছেড়েছ কাঁদিয়ে।'

'তুমি তো সবই জান্‌তে, তবে কেঁদেছ কেন?'

'তোমার দুঃখ দেখে কেঁদেছি,—আর কেন?'

'মিলি?'

'কি?'

'এ তো আমার স্বপ্ন নয়,—মিলিয়ে যাবে না তো এক্ষুণি?'

'স্বপ্নের মধ্য থেকে মুক্তি পেয়ে এসেচ। আর ভয় কিসের? আমার সঙ্গে এস। অপূর্ব্ব জীবনের মধ্যে

এসে পড়েচ। চল,—বাড়ি যাই। বড় ক্লান্ত লাগচে,—তাই না? লাগেই। মৃত্যুটা একটা কম হাঙ্গামা নয়—দুমড়ে মুচড়ে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।

মুখোমুখি মুগ্ধ নয়নে দুজনে চেয়ে রইল কতক্ষণ। মিলনানন্দে দুজনের চোখ উঠল অশ্রুসজল হয়ে।

'আরও কত সুন্দর হয়েছ, মিলি।'

'তুমিও তো হয়েছ,' বলে চামেলি ডান হাত দিয়ে প্রশান্তের বাঁ হাতটা ধরলে। যেমন করে' পূর্ব্বাকাশ সূর্য্যোদয়ের আভাসে হেসে ওঠে তেমনি স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্বচ্ছসুন্দর হাসি হাসলে চামেলী। বল্লে,—'চল। এখানে আর দেরি করবো না,—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য পড়ে রয়েছে সমুখে।'

চন্দনের গন্ধ বহন করে স্নিগ্ধ হাওয়া আসচে। উড়চে চামেলির বেণীবন্ধনহীন চুলের রাশি—আকাশে মেঘ-জালের মত। মরকতমণির রঙের শাড়ির হংসমিথুন-আঁকা প্রান্তটা চুলের সঙ্গে পাল্লা দিলে। প্রতিপদক্ষেপে নূপুর গুঞ্জনের মত শব্দ এল কানে।

যেদিকেই প্রশান্তের দৃষ্টি পড়ল দেখলে শুধু নীলকান্ত-মণির রঙের পাহাড়ের তরঙ্গ অন্তহীন প্রবাহে চলেছে: বাড়ি নেই, মানুষ নেই, শুধুমাত্র তরঙ্গিত বিস্তৃতি।

পাহাড়ের পাদদেশে যে রূপার রেখাগুলি দেখা যাচ্ছে, হয়তো সেগুলি নদীই হবে। কিন্তু প্রশান্ত কোনও প্রশ্ন করলে না,—অবর্ণনীয় এক পুলকাবেগে মহাবিস্তৃতির মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ম্ময়ী চামেলীকে অনুসরণ করে' চলল।

পথ একবার হল হীরার মত উজ্জ্বল, একবার হল নীলার মত স্নিগ্ধ, প্রবালের মত হল রক্তিম, নিকষের মত হল কালো, যুঁই ফুলের মত হয়ে উঠল শুভ্র। এমন স্বপ্নেও কখনও সম্ভব হয়নি,—কাব্যেও তৈরি হয়নি কখনও।

'আর কত দূরে আমাদের বাড়ি, মিলু!'

'পৃথিবীর হিসেবে পাঁচদশ লক্ষ মাইল হবে—এখানে তো দূরত্বের পরিমাপ নেই।'

'বল কি, পাঁচদশ লক্ষ মাইল?'

চামেলী হেসে বল্লে, 'তাতে ভয় পেলে বুঝি। ও হরি! বল তো, কত মাইল এসেচ এরই মধ্যে আমার সঙ্গে?'

'আধ মাইলের বেশি কিছুতেই হবে না।'

চামেলী খিলখিল করে হেসে উঠল,—যেন গিরিকন্দর থেকে লীলাময়ী এক ঝরণা ছুটে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের গায়ে হেসে কুটি কুটি হয়ে পড়ল। প্রশান্তকে টেনে নিলে

আরও গায়ের কাছে,—চোখটাতে একটা বাঁকা চাউনি হেনে সহাস্যে বল্লে—পৃথিবীর হিসেবে এক কোটি মাইল পার হয়ে এসেচ। স্থান কালের ব্যবধান নাই এই এখানে,—তাই বুঝতে পারনি।'

'লোকজন, গন্ধর্ব্ব, দেবতা কিছুই দেখচি না তো। বাড়ি দেখচি না, দেখচি না ঘর—জীবনযাত্রার কোনও আয়োজন চোখে পড়চে না তো।'

'পাবে, সবই দেখতে পাবে', চামেলি প্রশান্তর দিকে গভীর স্নেহে চেয়ে দেখে বল্লে,—'নতুন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তোমার চোখ সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যাবে,—লাগবে না বেশি দেরি। আমাকে তুমি ভালবাস বলেই এমন স্পষ্ট করে' দেখতে পেয়েচ।'

চামেলী সহসা পড়ল থেমে। চমকে উঠে প্রশান্ত সমুখে তাকিয়ে দেখলে। অনতিউচ্চ এক পাহাড়তটে ফুলের বন্যা ডেকেছে—তরঙ্গের পর তরঙ্গ কুসুমিত হয়ে অভিনব ছাঁদে রচনা করেছে সৌন্দর্য্যের আবর্ত্ত। কিন্তু বিস্ময়ে তার বাকরোধ হয়ে গেল উপরে তাকিয়ে। প্রথমে ভেবেছিল শৈলচূড়ায় চন্দ্রোদয় হচ্চে,—ক্রমে বুঝতে পারলে, অপরিচিত স্থাপত্যরীতিতে তৈরি এক বাড়ি ওটা।

'চামেলী!'

চামেলী হেসে তাকালে—তার চোখের দৃষ্টি থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার সন্দেহ নেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে তাকে।

'এটা কার বাড়ি ?'

'তোমার আর আমার।'

'ধ্যেৎ! ও তো রাজার বাড়ি।' প্রশান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে বল্লে।

'এ তো সবাই-রাজার-দেশ : রাজপ্রাসাদ আমাদেরও আছে।'

'কী জ্বলজ্বল করচে মিলি ; নিশ্চয়ই রূপোর তৈরি—কত রূপোই তবে আছে তোমাদের দেশে!'

চামেলী খিলখিল করে হেসে উঠে প্রশান্তের কাঁধে মুখ লুকোলে। হাসির ধকলটা কাটিয়ে উঠে প্রশান্তের হতভম্ব মুখের দিকে স্নেহকৌতুকমাখা অপূর্ব্ব মুখে চেয়ে বল্লে, 'দূর্, ও বুঝি রূপো ?'

'কি তবে ?'

'হাওয়া।'

'হাওয়ার বাড়ি ? তুমি কি যে বলচ, চামেলি ?'

'ওগো আনাড়ি, কদিন যাক, কিছুতেই আর অবাক হবে না। বিস্ময় তোমার যাবে ভেঙে।'

পাহাড়ীপথ বেয়ে তারা অক্লান্ত উঠে এল। হাতের চূড়িগুলি ঝঙ্কৃত করে চামেলী লাক্ষারঙের ফটকটা খুললে। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য থেকে কতগুলি পাখী মিষ্টি কলস্বরে কিচমিচ করে উঠ্‌লে। বায়ু উঠল অধিকতর সুরভিত হয়ে,—বাগানের ফুলডালে, ছন্দিত লতায় পড়ে গেল শিহরণ।

চামেলী মুখ ফিরিয়ে হেসে বল্লে, এস। প্রশান্ত যেন স্বপ্ন দেখচে—এই অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে সে প্রায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। অথচ চামেলী কি স্বাভাবিক ব্যবহার করচে তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাও সে লক্ষ্য করচে না, তা নয়। ফুল্লিত যে ভীরু ফুলশাখা এসে পথরোধ করেছিল, চামেলী একটু মৃদু হেসে তাকে কি অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে যে সরিয়ে দিলে!

'চামেলী?'

'কি?'

'না, না, আমি স্বপ্ন দেখচি।'

'না।'

'এই প্রবালের পালঙ্ক, এই মণির দীপাধার, এই রূপার দেওয়াল, এই সোনার মেঝে, এত ঐশ্বর্য্য কি করে সম্ভব?'

'যাঁর কল্পনাশক্তির অন্ত নেই ; হাওয়া দিয়ে যিনি গড়তে পারেন সূর্য্য চন্দ্র তারা ; কোটি কোটি জীব যার ইচ্ছামাত্র সৃষ্ট হয়ে ওঠে, অন্তহীন অপূর্ব্বসৃষ্ট লীলায় মহাকাল বিচিত্র হয়ে ওঠে যার আনন্দে, হাওয়া দিয়ে তিনি এ সামান্য গড়ে দেবেন, এতে বিস্ময় কেন? কোথায় প্রবাল, কোথায় মণি সোনা রূপা,—হাওয়া, হাওয়া, সব হাওয়া।'

'চামেলী, আমি কি পাগল হয়ে গেছি ?'

'বিছনাতে শুয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও লক্ষ্মীটি। সুস্থ বোধ করবে।' বলে চামেলী প্রশান্তকে বিছনায় শুইয়ে দিলে। তার চোখে মুখে বলয়িত সুন্দর হাতটা বুলিয়ে দিয়ে বল্লে, 'ঘুমোও।'

প্রশান্ত তার হাতটা টেনে নিলে নিজের বুকের মধ্যে, বল্লে,—'না, ঘুমোব না, মিলি।'

'কেন ?'

'তুমি কোথায় চলে যাবে স্বপ্নের মত।'

চামেলী স্নিগ্ধ চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল প্রশান্তের মুখের পানে, তারপর একটু মিষ্টি হেসে বসে পড়লে প্রশান্তের মাথার কাছটায়। প্রশান্তের বুক থেকে হাতটা সরিয়ে নিলে না। বল্লে,—'এই আমি রইলুম বসে,—

উঠবো না তোমার কাছ থেকে। নিশ্চিন্দি হয়ে তুমি ঘুমোও। বিশ্রাম যে তোমার দরকার; আর দুষ্টুমি করো না।'

হাত দিয়ে চামেলী প্রশান্তের চোখের পাতা বুজিয়ে দিলে। আঙুল দিয়ে আঁচড়ে দিতে লাগল প্রশান্তের মাথার চুল। অপূর্ব্ব আনন্দে প্রশান্তের নিদ্রা এল।

প্রশান্ত যখন জাগলে, মুখ না ফিরিয়েও টের পেলে চামেলীর উপস্থিতি—দেহসৌরভে সুগন্ধ, প্রেমে উজ্জ্বল।

'চামেলী?'

'উঠেচ?' চামেলী বল্‌লে।

'সন্ধ্যা হয়েচে?'

চামেলী শিয়র থেকে উঠে এসে সহাস্য মুখে প্রশান্তের গায়ের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল। কৌতুকভরা আঁখিতে চেয়ে বল্লে, 'সন্ধ্যা এখানে হয় না—তুমি উঠে এস।' বলে হাত ধরে' টেনে তাকে উঠিয়ে দিলে। বল্লে, 'কী কুম্ভকর্ণ! পৃথিবীর হিসেবে সাতদিন ঘুমিয়ে কাটালে।'

'বাঃ রে, কেবল তো সন্ধ্যে হচ্চে। শেষ-দুপুরে তো মাত্র ঘুমুলুম।'

'দূর, এ বুঝি সন্ধ্যে?' চামেলী হেসে বল্লে।

'কি তবে?'

'এখানে কি সূর্য্য আছে নাকি, যে ভোর হবে, রাত্রি হবে। হাওয়ার জগতে রঙের পর রঙ বদলাচ্চে—কোনোও নির্দ্দিষ্টতা নেই সময়ের, রঙের। এ-যেন শিল্পীর ছবি—যেখানে যখন যেটি মানায় সেই রঙটী পড়ে—রসানুভূতি ছাড়া তার আর কোনও নিয়ম কানুন নেই। আমাদের এই জগতে প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে নিত্যনতুন রূপের সৃষ্টি হচ্চে—নতুন ছবি হচ্চে তৈরি। নতুন নতুন রঙের সংমিশ্রণ, নতুন নতুন রূপ-কল্পনা। শুধু কি আলোর রঙ বদ্‌লায়? সবই বদ্‌লায় এখানে,—জীব ছাড়া আর এমন কিছু নেই যা বদলায় না।'

অবাক হয়ে প্রশান্ত বললে—'তোমাদের চারদিকের বিস্তৃতি, পাহাড়ের তরঙ্গ, নদীরেখা তাদের রূপও বদ্‌লায়?'

'বাইরে এসে দেখ্‌বে চল', বলে চামেলী তার একটা হাত প্রশান্তের হাতের সঙ্গে লতার মত জড়িয়ে নিলে। নিয়ে গেল তাকে ভেতরের দিকের খোলা বারান্দায়।

বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখলে প্রশান্ত। যেখানে এক সময় দেখেছিল পাহাড়ের পর পাহাড়ের অন্তহীন সারি, সেখানে দেখ্‌লে অন্তহীন বারিধির কৃষ্ণবর্ণ জলরাশি তরঙ্গিত হয়ে, আবর্ত্তন রচনা করে ফুলে' ফুসে' ছুটে

চলেছে। ভেসে চলেছে তারার দল, বঙ্কিম হিল্লোলে জ্যোতির্ম্ময় সর্পের মত ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ।

চামেলীকে আরও নিবিড় করে' চেপে ধরে' প্রশান্ত ভীতস্বরে বল্লে,—'এ কী চামেলী ?'

'ভয় নেই—এ রূপান্তর', চামেলী বল্লে।

'এমনি করে' সব কিছুই বদ্‌লে যায় ? স্থির কি কিছুই নেই ?'

'স্থির শুধু জীবাত্মা : আর কিছু স্থির নেই। ওরা নিত্যনতুন, পৌনঃপুনিকতায় অসুন্দর হয়ে ওঠে না, কখনও একঘেঁয়ে হয় না।'

'এই বাড়িও বদ্‌লে যাবে ?' প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

'যাবে বৈকি !' চামেলী বল্লে, 'পুরানো বাড়িতে আমি থাক্‌তে গেলুম কেন ?'

'মিলি ?'

'বল !'

'আমার ভয় করচে। তোমাকে আমাকে আবার ভেঙে মুচড়ে বদলে না দেয় !'

'দূর, তা কি দেয়। তোমাকে আমাকে সবাইকে আনন্দ দেবার জন্যই তো সৃষ্টিজোড়া এই অপূর্ব্ব লীলা চলচে।'

'কে এই লীলাময়, চামেলী ?'

চামেলী কোন্ও জবাব দিলে না—এক অজানার জন্য ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় তার অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ অবর্ণনীয় সুন্দর হয়ে উঠল। শুধু তেমনি করে প্রশান্তের হাতের সঙ্গে হাত জড়িয়ে তাকে এক প্রান্তের রুদ্ধদ্বার কোঠার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

ধূপের গন্ধের মত একটা অপূর্ব্ব সৌরভ প্রশান্তের নাকের ভিতর প্রবেশ করল। এক অদ্ভুত শিহরণ উঠল জেগে। ধীরে ধীরে ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রমের সঙ্গে চামেলীর হাত ধরে' প্রশান্ত সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রবেশ করলে।

চামেলী এগিয়ে গিয়ে একদিকের দেওয়ালের কাছে বিলম্বিত এক যবনিকা সরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—বিস্ফারিত চোখে প্রশান্ত দেখলে চেয়ে, এদিকের সম্পূর্ণ দেওয়ালে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়তা : যেন শুধু জ্যোতি নয়, এ যেন জীবনের গঙ্গোত্তরি। এ আলোর পরিচয় কিছু বলে দিতে হয় না,—সমস্ত চৈতন্যের মত এই আলোর আছে পরিচয়।

পাশে চেয়ে দেখলে লুটিয়ে পড়েছে চামেলী – একটি প্রণামে যেন সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে দিয়েছে। কোথা হ'তে প্রতিফলিত হল এই পূত দীপ্ত মধুর আলো তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করেও প্রশান্ত তার পাশে এই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়তার উদ্দেশ্যে লুটিয়ে পড়ল।

দৃশ্য আবার গিয়েছে বদ্‌লে। মহাসাগর মিলিয়ে গেল—জ্যোৎস্নাবর্ণের মত রঙ হয়েছে চতুর্দ্দিকের। বাড়ির অনেক নিচ দিয়ে সরু খালের মত তরল রূপা-ভরা একটা নদী এঁকে বেঁকে চলেছে। তার ওপারে মস্ত উঁচু দেখতে ফণি-মনসার ধরণের গাছ দিয়ে দেওয়াল-করা।

প্রশান্তকে বারান্দায় নিয়ে এল চামেলী। বল্লে, দেখ, দৃশ্য বদ্‌লে কী সুন্দর হয়ে উঠেচে। কেমন ভঙ্গী করে' অপ্সরার মত নেচে চলেছে নদীটা? দেখলে, কেমন রঙ বদ্‌লেছে চারদিকের,—এমন জ্যোৎস্না উঠেচে তোমাদের চাঁদ-দেখা-যাওয়া পৃথিবীতে? এইবার নতুন গন্ধ ভেসে আসবে হাওয়ায়।'

'মিলি?'

'কি?'

'কি সুন্দর সব : কি সুন্দর তুমি। এখন বুঝতে পারি, পৃথিবীতে কত সামান্য আনন্দকেই আমরা স্বর্গ মনে

করে' ধন্য হতাম। কত সামান্যই ছিল কল্পনা করার শক্তি! 'মিলি, তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শোব?'

চামেলী একটু হেসে উপবিষ্ট প্রশান্তের মাথাটা তার কোলে টেনে নিলে। এলিয়ে শুয়ে পড়ল প্রশান্ত। বল্লে, 'মিলি, এবার একটু গান চাই।'

'গান?'

'হ্যা গো।'

'এখানকার গান চাই?'

'হুঁ।'

'ভাষা নেই কিন্তু এখানকার গানের, আগেই তা বলে দিচ্চি,—শুধু মাত্র সুর দিয়ে মনের কথা প্রকাশ করতে হয়।'

'না থাকল ভাষা।'

চামেলী মৃদুস্বরে একটা সুর গাইলে। যেন এক চাঁদের থেকে জ্যোৎস্না পড়ল ঝরে—রজনীগন্ধার বুকে ঝরল শিশিরের ফোঁটা। মুগ্ধ হয়ে প্রশান্ত চেয়ে রইল তার মুখের পানে। গান গেল থেমে, তবু প্রশান্ত কিছু বল্‌লে না: চামেলী তার দিকে চেয়ে মৃদুমৃদু হাসতে লাগল।

'এ সুরের তো নাম জানি না মিলি।'

'কি করে জান্‌বে—এ যে এখানকার সুর।'

'আমাদের পৃথিবীর রাগরাগিণী গাওনা তোমরা ?'

'পৃথিবীর রাগরাগিণী পরিপূর্ণতা পেয়েই তো হয়েছে এখানকার গান—চেষ্টা করলে চিনতে পারবে। পৃথিবীর মধ্যে শুধু সঙ্গীতেরই আছে এই জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।'

'মিলি ?'

'কেন ?'

'এখানে কেউ কি কাজ করে না কোনও ?'

'বাঃ রে, তা করবে না কেন ? সবাই কাজ করে,—কেউ বসে থাকে না।' চামেলী বল্‌লে।

'কি কাজ করে ?'

'কেউ করে জ্ঞানের চর্চ্চা, কেউ করে গান, কেউ আঁকে ছবি, মূর্ত্তি গড়ায় কেউ, কেউ শোনায় গল্প, কেউ শোনায় কবিতা—

'আর ব্যবসা ?' প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলে।

শুনে চামেলী আবার হেসে উঠে একেবারে গড়িয়ে পড়লে। আঙুল দিয়ে হতভম্ব প্রশান্তের গালটা টিপে দিয়ে বল্লে,—'এটা কি পৃথিবী নাকি যে ব্যবসা থাক্‌বে—থাক্‌বে মিথ্যে মাটীর ঢেলার জন্য কাড়াকাড়ি ? আচ্ছা

এই যে পৃথিবীতে মানুষ চিত্তের ও বিবেকের অধিকাংশ ধর্ম্মগুলিকে বিসর্জ্জন দিয়ে, কলহ করে,' চাতুরি করে', দরিদ্রদের বঞ্চিত করে' ব্যাঙ্ক ভরতি করে, তার মূল্য কতটুকু, তা বোঝে না কেন ? মাটীর ঢেলা জমাতে গিয়ে অন্যদিকে আর মন দেবার অবসর পায় না ;—যে দেহটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে একদিন, তার সেবায় এমন আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যাপৃত হবে যে সে মূর্খতা দেখে না হেসে থাকা যায় না।'

'ব্যবসা বাণিজ্য করে না, তবে খায় কি ?'

'তোমার কি সঙ্গে একটা শরীর আছে নাকি যে খেতে হবে ? আচ্ছা, তুমি কি এতক্ষণে একবার খাওয়ার কথা বলেছ ?' চামেলী হেসে উঠে বললে।

প্রশান্ত অনেকক্ষণ ভেবে বললে—'খাওয়ার দরকার নেই, তবে কাজ করে কেন ?'

'কেন ?' চামেলী প্রশান্তের গলায় একটা হাত মালা করে পরিয়ে দিয়ে বল্লে—'তুমি আমায় ভালবাস কেন ? কবি কবিতা লেখে কেন ? চিত্রকর না খেয়ে মরলেও ছাড়ে না কেন ছবি আঁকা ! এও তেমনি—কাজ করা এখানে স্বাভাবিক, নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ। ভেবে দেখ তো, খাওয়ার সংস্থান করতে গিয়ে পৃথিবীতে

কত লোক নিজেকে করে খর্ব্ব—নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা-গুলিকে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। যে হতো সঙ্গীতজ্ঞ, তার হ'তে হয় ইস্কুল মাষ্টার, চিত্রশিল্পী ছবি আঁকা ছেড়ে বইয়ের ব্যবসা করে; কবিকে হতে হয় উকিল; জ্ঞানের জন্য যার পিপাসা তাকে হিসেবনিকেশের তদারকি করতে হয়—এর চাইতে বেশি শোচনীয় আর কী হতে পারে!'

'ওগো।'

'কি?' প্রশান্ত বললে।

'ঘরে আর লাগচে না ভাল—চল না বেরিয়ে পড়ি।'

'চলো।'

হাত ধরাধরি করে চামেলী আর প্রশান্ত বেরিয়ে পড়লে। তরঙ্গিত সভঙ্গ উদার বিস্তৃতি পড়ে আছে চতুর্দ্দিকে। রঙের স্বপ্নজাল হয়েছে বোনা।—সুগন্ধি বায়ু রোমাঞ্চ স্পর্শ বিতরণ করছে।

এই দিকচক্রবালহীন অনন্ত মহা-বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে তারা দুজনে চলেছে মূর্ত্তিমান আনন্দের মতন—যেন দুইটী জ্যোতিঃশিখা আলোর বার্ত্তা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতায় করেছে তীর্থযাত্রা, সমস্ত বিশ্বজগতকে পুলকিত করে' তুলবে। নাই জন, নাই গৃহ, নাই কোলাহল—

শুধু আছে চামেলী, আছে প্রশান্ত, আছে অনন্ত বিস্তৃতি আর অনন্ত প্রেমাবেগ।

চামেলী হেসে বল্লে, 'আমি ছুটি, আমায় ধর দেখি।' বলে খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুট লাগালে। বিচ্ছেদাশঙ্কাতুর প্রশান্ত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু দেখলে চামেলি ধরাপড়ার জন্য অপেক্ষা করছে। নিশ্চি হয়ে সেও ছুট্‌তে লাগল।

পাহাড়ের পর পাহাড় পায়ের তলা দিয়ে সমু উত্তুঙ্গ তরঙ্গের মত পার হয়ে গেল—শ্রান্তি নেই, ক্ল নেই, যেন শুধু নাগরদোলায় দুলচে। দুজনের হাসিতে উচ্চকিত হয়ে উঠল নিস্তব্ধ বাতাস,—এই অনন্ত বিস্তৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলকের প্রতিধ্বনি জেগে উঠ্‌ল।

অদ্ভুত এক ফুলকাননে এসে পৌঁছল তারা। ফুল, ফুল, সর্ব্বত্র ফুল—মাথার উপরে, পায়ের তলায়। যেন ফুলের বাগান নয়—রঙ দিয়ে আঁকা ছবি—একটুখানি তার শূন্য নয়, বিচিত্র অপূর্ব্ব রঙের প্রলেপ পড়েছে সর্ব্বত্র আগাগোড়া তার ফুল দিয়ে তৈরি। ঘনসুগন্ধ-মিশ্রণে আবেশ লেগে যায়—চোখ স্তিমিত হয়ে আসে।

'মিলি!'

'কি?'

জলের ভেতর নেমে গেল চামেলী প্রথমে—ডুবে গেল। প্রশান্তও পড়ল ঝাঁপিয়ে, চামেলীকে রক্ষা করতে। দেখলে জলের মধ্যেও কোনও অস্বস্তি বোধ করচে না। এতক্ষণে চামেলীর হাসি কৌতুক করে উঠল।

জলের মধ্য দিয়ে হাত ধরাধরি করে তারা উঠল গিয়ে পরপারে

'কোথায় যাচ্চি আমরা, মিলি ?'

'খ্যাতনামাদের জগতে।'

'কতদূর ?'

'সূক্ষ্মতর বায়ুতে।'

'সে কি ?'

'এস আমার সঙ্গে।' চামেলী বল্লে।

চলল তারা দুজনে। দৃশ্য মিলিয়ে গেল সব—তরঙ্গিত বিস্তৃতি বর্ণহীন ভঙ্গীহীন হয়ে উঠল—মহাব্যোমের মধ্য দিয়ে তারা চলেছে। চামেলীর ঘোমটা গেছে উড়ে—দুলচে তার বেণীটা। বনহরিণীর মত হল গতি। প্রশান্ত স্তম্ভিত বাক্‌হীন স্খলিতপদে চলেছে তাকে অনুসরণ করে।

চেয়ে দেখলে দূরে। এক জ্যোতির্ম্ময় জগত উদিত হচ্চে চোখের সমুখে—স্পষ্টতর হয়ে উঠচে তার রূপ। কিন্তু এখানে পৌঁছেনি তার আলো—এক গোধূলির ঈষৎ

অন্ধকারে তাদের পথ অস্পষ্ট হয়ে উঠেচে। মৃদু-সঙ্গীত ধ্বনি পৌঁছল এসে কানে। বাতাস নতুন সুগন্ধে ভরে গেল।

কোথায় চামেলী? হাত থেকে তার হাত খসে গেছে কখন? অস্পষ্ট অন্ধকারে সে ছায়া হয়ে গেছে—শুধু দেখা যাচ্ছে তার দোল্-খাওয়া বেণীটা। চামেলী! চামেলী!

*　　　*　　　*　　　*

চম্‌কে চোখ মেলে প্রশান্ত দেখলে সমুখে বারান্দার রেলিঙ, তার পরে কৃষ্ণচূড়া গাছের চূড়া। শুয়ে আছে সে ইজিচেয়ারে। কোথায় স্বর্গ, কোথায় চামেলী! যেন একটা তীব্র আঘাত খেয়ে প্রশান্ত আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌ল। সজোরে চোখের পাতা বুজিয়ে ফেল্লে। মনে মনে চিৎকার করে বল্লে—না, আমি মরে গিয়েচি; না, আমি নেই পৃথিবীতে। যদি মরে নাও থাকি, এখনই আমি মরতে চাই। এই বিশ্রী জগতে কে থাক্‌বে—আমি থাক্‌তে পারব না, চামেলী।

-বার—১

বারিধি

প্রশান্তের মধ্যে অদ্ভুত এক পুলকের বন্যা ছুটে এল : কোনও হেতু নেই, কোনও আড়ম্বর নেই, অথচ সমস্ত চৈতন্যে কী যে এক পুলকাবেগ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌চে, তার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। আনন্দ, আনন্দ, শুধু আনন্দ,—একটু নাই অবসাদ, একটু নাই আশঙ্কা, ভাষা দিয়ে একে প্রকাশ করা যায় না।

চোখ মেলে চাইলে প্রশান্ত। কিছুই দেখতে পেলে না,—অন্ধকারও না। হাতটা মুখের কাছে উঠিয়ে একটা আঙুল কামড়ালে;—কিন্তু টের পেলে না কিছুই। জিবটা বের করে' ঠোঁটটা স্পর্শ করতে চাইলে, কিন্তু পেলে না স্পর্শ, অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারচে তার ঠোঁটের অস্তিত্ব, তার জিহ্বার সচলতা। পা ঠিক আছে তো? হাতটা দিয়ে

ছুঁয়ে দেখতে চেষ্টা করলে,—পায়ের যথাস্থানে তাদের কোনও সন্ধানই মিলল না। দৌড়াতে চেষ্টা করলে,—দেখলে চমৎকার পারচে। মাথাটা ধরতে গেল হাত দিয়ে,—কিন্তু কোথায় মাথা! ভোজবাজীর মত সেটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেচে,—অথচ স্পষ্ট ভাবতে পারচে প্রশান্ত, তার বুদ্ধিবৃত্তি, তার চৈতন্য একটু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

এই যে চামেলীর উপস্থিতিটা টের পাচ্চে সে। চোখ মেললে,—আলোও নেই, অন্ধকারও নেই, নেই চামেলী। অথচ এই তো পাশেই রয়েচে চামেলী,—তার উপস্থিতির সমস্ত মাধুর্য্য পাওয়া যাচ্ছে মনের মধ্যে,—গন্ধে, দীপ্তিতে, কৌতুকে, মাধুর্য্যে, প্রেমে অপূর্ব্ব একটা আসঙ্গ।

'চামেলী' বলে ডাকতে গেল প্রশান্ত, কিন্তু নিজের কানেই শুনলে না সে আহ্বান। অথচ নিবিড়তর হল চামেলীর আসঙ্গ। পুলকের আবেশে প্রশান্তের মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হল। চামেলী বলচে না কথা, চোখ দেখচে না তার রূপ, অথচ চামেলীর সান্নিধ্যে জেগে উঠল কল্পনাতীত মাধুর্য্য,—যার একমাত্র বর্ণনা,—'ভালো লাগচে,—বড় ভালো লাগচে।' মনে হল, নিবিড়তম করে' পাওয়া গেল চামেলীকে।